রূপায়ণ

শাহাদাৎ হোসেন

দাম বার আনা

প্রকাশক :—
দি গ্রেট ইষ্টার্ণ লাইব্রেরার পক্ষে
আবদুর রহিম খান,
১৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৪০

ঢাকা,—
নবাবপুর নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে
শ্রীকালাচাঁদ বসাকদ্বারা মুদ্রিত

কল্যাণীয়

শ্রীমান মোল্লা নাসিরুল হক্

কল্যাণীয়েষু



 

রূপায়ণ বেরুলো। যে গল্পগুলো বিভিন্ন মাসিকে বেরিয়েছিল, সেইগুলিই একত্র কোরে রূপায়ণের সৃষ্টি হোল। এখন বাংলার পাঠক সমাজ একে সাদরে বরণ কোরে নিলেই আমার শ্রম সার্থক হয়। ইতি—

আশ্বিন, ১৩৬০
পণ্ডিতপোল, হাড়োয়া,
২৪ পরগণা



শাহাদাৎ হোসেন

রূপায়ণ



প্রতিশোধ

১

পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে পাটের ফেঁসো মাখিয়া সন্ধ্যার পর মুঙ্লী তাহাদের কুলী লাইনের ছোট্ট ঘরখানিতে আসিয়া 'গোঁজ' হইয়া বসিল। ঘরের এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর ঝংরু শুইয়া ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে রে মুঙ্লী।

মুঙ্লী উত্তর দিল না। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

ঝংরুর মনে কেমন যেন একটা খট্কা লাগিল। মুঙ্লীর কি তবে অসুখ করিয়াছে!

জরাক্রান্ত দেহখানি লইয়া সে টলিতে টলিতে মুঙ্‌লীর কাছে উঠিয়া আসিল। তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, মুঙ্‌লী—ও মুঙ্‌লী!

মুঙ্‌লী মাথা তুলিয়া একবার ঝংরুর মুখের পানে চাহিল। ঝংরু বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার চোখ দুইটী জবা ফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনের কোণে একটা প্রবল সন্দেহ চাগাড় দিয়া উঠিল। সে বুঝি আবার কিছু বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু মুঙ্‌লী তাহাকে সে অবসর দিল না, তাহার হাত ধরিয়া বিছানার উপর লইয়া গিয়া পুনরায় শোয়াইয়া দিল। কিন্তু শোয়াইয়া দিলেও ঝংরু স্থির থাকিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল কি হোয়েছে মুঙ্‌লী!

—কিছু হয়নি, তুই চুপ কোরে' 'শো'।

ঝংরু মুঙ্‌লীর কথায় বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহার চোখ মুখ দেখিয়া সে স্পষ্টই বুঝিল, একটা কিছু অঘটন নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে, তাই সে মুঙ্‌লীর বাধা না মানিয়া বলিয়া উঠিল, কিছু হয়নি তবে অমন কোরে' আছিস কেন?

মুঙ্‌লী একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই চুপ কোরে' শুবি, না বগ্‌ বগ্‌ কোরে' অসুখ বাড়াবি?

ক্ষুব্ধ অভিমানে ঝংরু পাশ ফিরিয়া শুইল।

ছোট্ট ঘরখানির জমাট আঁধারের মধ্যে মুঙ্‌লী কিছুক্ষণ নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া কেরোসিনের ল্যাম্পটী জ্বালাইয়া একখানি 'দাঁতভাঙা' চিরুণীর সাহায্যে চুলের ফেঁসো ছাড়াইতে বসিল।

২

ভোর সাড়ে পাঁচটার 'ভোঁ' ঝংরুর ঘুম ভাঙাইয়া দিল। তাহার জ্বর তখন একেবারেই ছাড়িয়া গিয়াছে। শরীরটা বেশ 'হাল্‌কা' 'হাল্‌কা' বোধ হইতেছে। তাই উঠিয়া বসিয়া মুঙ্‌লীকে জাগাইতে আরম্ভ করিল। মুঙ্‌লী পাশ ফিরিয়া শুইল মাত্র—কোন সাড়া দিল না; শেষে অনেক ডাকাডাকির পর বিরক্তিভরে জানাইয়া দিল—সে 'কাজে' যাইবে না। রাত্রির সন্দেহটা ঝংরুর মনে আবার প্রবল হইয়া দেখা দিল, কিন্তু কোন উচ্চ বাচ্য করিল না, মনের মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব অনেক-কিছু তোলা-পাড়া করিতে করিতে সে পুনরায় বিছানার উপর দেহ ঢালিয়া দিল।

যখন ঘুম ভাঙিল, তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। পাশ ফিরিয়া দেখিল, মুঙ্‌লী নাই। তাহার মনের সন্দেহের ভাব যেন অনেকখানি নামিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল, কারো সঙ্গে বোধ হয় ঝগ্‌ড়া-বচসা হইয়াছিল, কিম্বা শরীরটা তত ভাল ছিল না, তাই মুঙ্‌লী কাল অমন করিয়াছিল, এখন বোধ হয় সে-সব গ্লানি কাটিয়া গিয়াছে—তাই আবার কাজে গিয়াছে।

ঝংরু উঠিয়া বসিল। ঠিক সেই সময় সর্দ্দার শ্যামলাল ঘরের ভিতর ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুঙ্‌লী কোথায় রে ঝংরু!

ঝংরু বিস্ময়-দৃষ্টিতে শ্যামলালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কেন—সে যে 'কাজে' গিয়েছে!

—কোথায় 'কাজে' গিয়েছে? এই ত আমি সারা 'কল' তাকে খুঁজে এলুম।

—তবে ?—

ঝংরুর বুকের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

শ্যামলাল বিশেষ ব্যগ্রতা দেখাইয়া বলিল, কোথায় গিয়েছে শীগ্‌গির বল্—আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না। বড় সাহেব এখনই একবার তাকে কুটীতে ডেকে পাঠিয়েছে।

বড় সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে! তা' আবার কুটীতে! এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা ঝংরুর সাম্‌নে পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার দুই চক্ষু আগুনের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে শ্যামলালের মুখের পানে চাহিল। ইচ্ছা—দৃষ্টি-আগুনে তাহাকে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া দেয়।

শ্যামলাল ঝংরুর এই দৃষ্টির অর্থ যে না বুঝিল, তাহা নয়। কিন্তু সেজন্য সে মোটেই 'পরোয়া' করিল না। উপরন্তু বেশ একটা ধম্‌কানির সঙ্গে পুনরায় বলিয়া উঠিল, বড় ড্যাব্‌ড্যাব্‌কোরে' চেয়ে আছিস যে? কোথায় গিয়েছে—বল্ শীগ্‌গির!

ঝংরুর মনে হইল, সেই মুহূর্ত্তেই পাষণ্ডের মুণ্ডুটা টানিয়া ছিঁড়িয়া তাহার 'সর্দ্দার' জীবনের শেষ করিয়া দেয়, কিন্তু সহসা অতখানি করা ভরসায় কুলাইল না। তাই গম্ভীর ভাবে জবাব দিল—জানি না।

—ওরে বেটা জঙ্‌লী, নিজের ভাল বুঝিস না। তাকে এখুনি পাঠিয়ে দে, তোর কপাল ফির্‌বে।

এবার আর ঝংরু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বাঘের মত লাফাইয়া উঠিয়া সর্দ্দারের টুঁটি চাপিয়া ধরিল। কিন্তু কয়দিনের জ্বরে তাহার শরীর কাবু হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই অল্প কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর সর্দ্দারেরর হাতে তাহার পরাজয় ঘটিল। সে ভূতল আশ্রয় করিল।

কিন্তু তাই বলিয়া সর্দ্দারের রাগ থামিল না। ভূতলশায়ী ঝংরুকে সে যতক্ষণ পারিল, কিল, চড়, লাথি বসাইল। তাহার পর বুঝি অপারগ হইয়া সে-স্থান ত্যাগ করিল। যাইবার সময় শাসাইয়া গেল, তাহাকে সম্মুখে রাখিয়াই সে মুঙ্‌লীর সর্ব্বনাশ করিবে, তবে তাহার নাম 'শ্যাম বারুই'।

ধস্তাধস্তি ও প্রহারের ফলে দুর্ব্বল ঝংরু একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল—উঠিবার সামর্থ্য ছিল না। বহুক্ষণ পরে মুঙ্‌লী আসিয়া যখন তাহাকে ডাক দিল, তখন যেন তাহার চৈতন্য হইল। সে চোখ মেলিয়া চাহিল। মুঙ্‌লী জিজ্ঞাসা করিল, অমন কোরে' পোড়ে' আছিস কেন, কি হোয়েছে ?

ঝংরু উত্তর দিল না। মুঙ্‌লীর মুখের পানে একবার চাহিল মাত্র।

মুঙ্‌লী আবার জিজ্ঞাসা করিল, কেউ এসেছিল ?

হুঁ—বলিয়া ঝংরু মাটিতে মুখ গুঁজিয়া দিল।

—কে ?

ঝংরু সেই অবস্থাতেই উত্তর দিল—সর্দ্দার।

ঘটনাটা পরিষ্কার হইয়া গেল। মুঙ্‌লী সবই বুঝিল।

৩

সাত বৎসর আগে পেটের দায়ে হাজারীবাগের এক পাহাড়ী 'বস্তী' হইতে মুঙ্লীকে লইয়া ঝংরু বাংলা দেশে চলিয়া আসে এবং সেই হইতে এ-পর্য্যন্ত তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে 'গতোর' খাটাইয়া বাংলার বুকেই 'কায়ক্লেশে' দিনপাত করিয়া আসিতেছে। অবশ্য এই সাত বৎসর এক জায়গাতেই যে তাহারা বসবাস করিয়াছে, তাহা নহে। যখন যেখানে কাজের সুবিধা পাইয়াছে, তখন সেইখানে গিয়াই বাস করিয়াছে। চটকলের এই কুলী লাইনে তাহাদের বসবাস আরম্ভ হইয়াছে—গত দুই মাস হইতে। নানারকম অসুবিধা এবং অত্যধিক পরিশ্রম সত্ত্বেও এই পার্ব্বত্য দম্পতি এখানে অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা সুখে স্বচ্ছন্দেই দিন কাটাইতেছিল ; কারণ, চটকলে যে উপার্জ্জন হইত, তাহাতে দু'বেলা ইহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত।

প্রথম যখন ইহারা বাংলা দেশে আসে, তখন মুঙ্লীর বয়স পনেরো আর ঝংরুর বাইশ। সুদীর্ঘকাল বাংলা দেশে বাস করার এবং বাঙালীর সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশার ফলে ইহারা এখন আচার-ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় একেবারেই 'বাঙালী' হইয়া উঠিয়াছে। জঙ্লী ভাবটা ষোল আনা না হউক, বারো আনা রকম কাটিয়া গিয়াছে।

চটকলে ভর্ত্তি হওয়ার কয়েক দিন পরে মুঙ্লীর উপর বড় সাহেবের কুদৃষ্টি পড়ে। কলের মজুরনীদের প্রায় সকলেই (অবশ্য যাহাদের দেহে যৌবনের ছাপ আছে) এই বড় সাহেবের লালসার খোরাক যোগাইয়াছে। কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাক, মোটা মোটা বখ্‌সিস্‌ লইয়া ও দরকার হইলে পুনরায় হুজুরে 'এত্তেলা' দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সগর্ব্বে গৃহে

ফিরিয়াছে; কাজেই সাহেবের লালসার ক্ষুধা দমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই গিয়াছে।

মুঙ্‌লীকে প্রথম দেখার পর দিন হইতেই সাহেব তাহাকে হাত করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল; কিন্তু মুঙ্‌লী তাহাকে সে সুযোগ দেয় নাই। সে সাধ্যমত তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিত। কারণ সাহেবের কীর্ত্তি-কথা সে সমস্তই শুনিয়াছিল। কিন্তু কাল সে আর নিজেকে সাম্‌লাইতে পারে নাই। কল হইতে বাহির হইতেই দুর্ভাগ্যক্রমে সে হঠাৎ সাহেবের সম্মুখে পড়িয়া যায়, সাহেবও সুযোগ বুঝিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে; কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। চারিদিকে লোকজন, কাজেই সাহেব একবার মুচ্‌কি হাসিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, রাট্‌ ডস্‌ বাজে মেরা কোট্‌ঠীমে মোলাকাট করো।

মুঙ্‌লীর দেহের সমস্ত রক্ত তখন মাথায় উঠিয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। যন্ত্রচালিতের মত সে লাইনের দিকে অগ্রসর হইল।

সকালে উঠিয়াই মুঙ্‌লী ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল—রাত্রিতে যখন সাহেবের কুঠীতে যায় নাই, তখন সাহেব সকালে আসিয়া নিশ্চয়ই তাহার খোঁজ করিবে এবং কলের মধ্যে দেখিতে না পাইলে এ-পর্য্যন্তও লোক পাঠাইবে। তাই উপদ্রব এড়াইবার জন্য সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া কুলী লাইনের সীমার বাহিরে এক নির্জ্জন ঝোপের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

* * * * * *

বেলা ১টা। মুঙ্‌লী ঝংরুকে ভাত খাওয়াইয়া, নিজের ভাত বাড়িয়া সবেমাত্র বসিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় বড় জমাদার আসিয়া ডাক দিল—ঝংরু!

ঝংরু শুইয়াছিল। উঠিয়া বসিল। জমাদার গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, বড়া সাব্ আভি তুম্‌কো বোলা রহেঁ—জল্‌দি আও।

ঝংরুর মাথায় সাঁওতালী রক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোণ হইতে বহুদিনের অব্যবহৃত দীর্ঘ শালের লাঠিটি তুলিয়া লইয়া বলিল, চল্।

মুঙ্‌লী এতক্ষণ ভাতের কাঁসিটা সম্মুখ হইতে সরাইয়া রাখিয়া জড়ের মত নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিল। এখন লাঠিহস্তে রুদ্রমূর্ত্তি ঝংরুকে ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সহসা যেন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। সে ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া লাঠিটা ধরিয়া ফেলিল এবং তিরস্কারের দৃষ্টিতে ঝংরুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, লাঠি নিয়ে কোথায় যাস্?

ঝংরুর উদ্দীপ্ত ক্রোধ সহসা ধাক্কা খাইয়া দমিয়া গেল। তাহার হাতের মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। মুঙ্‌লী লাঠি গাছটা কাড়িয়া লইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। ঝংরু, কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল, তাহার পর জমাদারকে বলিল,—চল্।

ঝংরু চলিয়া গেল। মুঙ্‌লী দরজায় দাঁড়াইয়া যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তারপর দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

৪

সমস্ত দিন আর কেহ মুঙ্‌লীর কোন সন্ধান পাইল না। সাহেবের লোক তিন চারিবার আসিয়া খোঁজ করিয়া ফিরিয়া গেল। শেষে হতাশ হইয়া সাহেবকে সংবাদ দিল—মুঙ্‌লী পলাইয়াছে।

রাত্রি ১২টা। মুঙ্‌লী আসিয়া ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিল দরজা পূর্ব্বের মতই বাহির হইতে তালা বন্ধ আছে, তবে কি ঝংরু ফিরে নাই? তাহার বুকের ভিতরটায় যেন কেমন করিয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িল দরজার সম্মুখে—সেখানে কি যেন একটা পড়িয়া আছে। অন্ধকারে ঠিক ধারণা করিতে না পারিয়া সে দুই পা অগ্রসর হইল। একি! এযে মানুষ! আশায়, উৎকণ্ঠায় তাহার বুকের ভিতরটায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। আরও নিকটে গিয়া সে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃৎস্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল। এযে ঝংরুর শব! তবে কি সত্যই সব শেষ হইয়াছে! মুঙ্‌লীর বুকের ভিতরকার নিরুদ্ধ ক্রন্দন বাহিরে ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। কোনও রূপে আত্মসম্বরণ করিয়া সে ঝংরুর মুখের কাছে মুখ লইয়া দেখিল, নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে কিনা!

না! তবে শব নয়—এখনও আছে! মুঙ্‌লীর প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল এবং দীপ জ্বালিয়া পুনরায় বাহিরে আসিল।

একি! মুঙ্‌লী চমকিয়া উঠিল। ঝংরুর সর্ব্বাঙ্গে বেতের দাগ, স্থানে স্থানে কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে! মুঙ্‌লীর দু'চোখ ফাটিয়া জল

আসিল। নিজের উপর তাহার ক্রোধ চড়িয়া উঠিল। কেন সে ঝংরুকে খালি হাতে পাঠাইয়াছিল, কেন তাহার হাতের লাঠি কাড়িয়া লইয়াছিল? তাহা না করিলে ত এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না। লাঠি হাতে থাকিলে যে যমরাজও ঝংরুর কাছে ঘেঁসিতে পারে না!

মুঙ্লী মাথায় হাত দিয়া আহতের শিয়রে বসিয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে ঝংরুর চৈতন্য ফিরিয়া আসিতেছিল। সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল, মুঙ্লী।

মুঙ্লী জবাব দিল না। শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার তপ্ত ললাটে স্নেহস্পর্শ বুলাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে মুঙ্লী মৃদু স্নেহকণ্ঠে বলিল, ঘরে গিয়ে শুবি চল্, এখানে থাক্লে কেউ আবার দেখে ফেল্বে!

সত্যিই ত!

সহসা যেন ঝংরুর ঘোর কাটিয়া গেল। তখনি উঠিয়া মুঙ্লীর কাঁধে ভর করিয়া সে টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিন্তু ঘুম কাহারও হইল না। উদ্বেগ, আশঙ্কার মধ্য দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে লাগিল। রাত্রিও দেখিতে দেখিতে শেষ হইতে চলিল। সহসা মুঙ্লী বলিয়া উঠিল, চল্—আমরা এখান থেকে পালাই।

—কোথায়?

—দেশে।

একটা টানা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ঝংরু বলিল, দেশে! দেশে গিয়ে কি খাবি?

—আগে যা' খেতুম, তাই খাব—আবার কি খাব?

তাহার কণ্ঠস্বরে যেন একটু বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল।

পূর্ব্ববৎ হতাশার সুরে ঝংরু বলিল, আগে খেতিস বনে জঙ্গলে শীকার কোরে এখন—

বাধা দিয়া মুঙ্‌লী বলিল, এখন কি বনে-জঙ্গলে শীকার ফুরিয়ে গিয়েছে, না বর্শা ভোঁতা হোয়েছে ?

সহসা ঝংরু উঠিয়া বসিল। তাহার দেহের বেদনা, মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা সমস্তই যেন মন্ত্রবলে কোথায় উড়িয়া গেল। সে মুঙ্‌লীর হাত চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল পারবি ?

দৃঢ়স্বরে মুঙ্‌লী উত্তর করিল, কেন পারবোনা,—খুব পারবো।

—তবে চল্‌— এই রাত্রেই—এখনই।

দুর্দ্দিনের বন্ধু লাঠিগাছটী হাতে লইয়া সেই রাত্রেই ঝংরু মুঙ্‌লী-সঙ্গে কুলী লাইন ত্যাগ করিল।

৫

তিন বৎসর পরের কথা। হাজারীবাগের জঙ্গলের ধার দিয়া এক বন্দুকধারী সাহেব দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিতেছে। শীকার করিতে জঙ্গলে আসিয়া সাহেব সঙ্গী ও পথ দুই-ই হারাইয়া বসিয়াছে।

সূর্য্য তখন অস্তে গিয়াছে। সন্ধ্যার কালো ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। রাত্রি আসিবার পূর্ব্বেই কোন 'বস্তী'তে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে। নচেৎ এই নির্জ্জন জঙ্গল-সীমান্তে হিংস্র জন্তুর হাতে প্রাণ হারাইতে হইবে।

সম্মুখেই পাহাড়। পাহাড়ের ওপারে সাঁওতাল-বস্তী দেখা যাইতেছে। ঐ বস্তীতে গিয়াই আশ্রয় লইতে হইবে। সাহেব যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। সহসা বনভূমি কম্পিত করিয়া এক ভীষণ গর্জ্জন উঠিল। সর্ব্বনাশ! এ যে বাঘের গর্জ্জন! ত্রস্ত চকিত নেত্রে সাহেব একবার চতুর্দ্দিকে চাহিল, কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না। বন্দুকটী সোজা করিয়া ধরিয়া সে গতি আরও দ্রুত করিয়া দিল। আবার সেই গর্জ্জন! সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী ঝোপের আড়াল হইতে এক ভীষণকায় ব্যাঘ্র সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত সাহেবের উপর আসিয়া পড়িল। ঠিক সেই সময় পাহাড়ের তলদেশ হইতে একখানি শাণিত বর্শা বিদ্যুতের মত আসিয়া বাঘের বক্ষ ভেদ করিল। শীকার ছাড়িয়া বাঘ নিজেই শীকার হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

সাহেব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। অল্পক্ষণ-পরে যখন তাহার চৈতন্য সঞ্চার হইল, তখন চোখ মেলিয়া দেখিল, এক সাঁওতাল যুবতী পর্ণপুটে জল লইয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিতেছে। যুবতীর মুখের পানে চাহিতেই

সাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। অতিমাত্র বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, you—you—that—

মুঙ্লী পূর্ব্বেই সাহেবকে চিনিয়া লইয়াছিল। তাই ভাষা না বুঝিলেও হাবভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মনের কথা বুঝিয়া লইয়া বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, হাঁ সাহেব, থামো। আমি সেই—

মুঙ্লী হঠাৎ থামিয়া গেল। কে যেন তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। বিপন্নকে লজ্জা দিতে অসভ্য বন্য রমণীর বিবেকও বুঝি বাধা পাইল।

সাহেব আর তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিল না। নিদারুণ ঘৃণায়, লজ্জায় সে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

এদিকে আঁধার ঘনীভূত হইয়া আসিল। মুঙ্লী সাহেবকে বলিল, চল সাহেব আমাদের ঘরে চল। তোমার কোন ভয় নেই, আমরা তোমার কোন অনিষ্ট কোর্ব না। সকালে উঠে যেখানে ইচ্ছা তুমি চোলে' যেয়ো। রাত্রিতে এখানে থাক্‌লে আবার বাঘের হাতে পোড়্‌বে।

সাহেব উঠিয়া বসিল। বাঘের আক্রমণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেও সে আদৌ আঘাত পায় নাই। মুঙ্লী বাঘকে সে অবসরই দেয় নাই।

সাহেবকে উঠিতে দেখিয়া মুঙ্লী বাঘের পেট হইতে বর্শাটা টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া আগে আগে চলিল। সাহেব নীরবে নতমস্তকে তাহার পিছু পিছু চলিল।

কুটীরের সম্মুখে পৌছিয়া মুঙ্লী হাঁকিল, সর্দ্দার, বাত্তি দেখা রে!

ঝংরু আলো লইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল—মুঙ্লীর পশ্চাতে একজন অপরিচিত আগন্তুক। সে অগ্রসর হইয়া আলোটা আগন্তুকের মুখের কাছে ধরিল। অমনি মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত সমস্ত মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। চোখ দুইটা হিংস্র বাঘের চোখের মত ধক্

ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুঙ্লী তাহার ভাব বুঝিয়া একটা ধমক দিয়া বলিল, তুই 'বাউরা' হোয়েছিস সর্দার, ও যে অতিথ্!

রাত্রিতে বন্য ফলমূল খাওয়াইয়া মুঙ্লী সাহেবকে বাঘছাল বিছাইয়া শুইতে দিল। সাহেব শুইয়া পড়িয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, A revenge indeed—but wonderful revenge!

সন্ধি

১

আকাশস্পর্শী আরাবল্লীর পাদমূলে ঝরণার পাশে দাঁড়াইয়া দুইটী বালক বালিকা। বালকের বয়স দশের অনধিক, বালিকা ত্রয়োদশী—কিশোরী।

দীপ্ত দ্বিপ্রহর। খর রৌদ্রে ঝলসিতা প্রকৃতি অগ্নিশ্বাসে ধুকিয়া মরিতেছে। আকাশে বাতাসে তরল জ্বালা, তীব্র দাহে দিগ্বধূর কম্র মুখে তাম্র দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বালক, বালিকাকে গৃহে ফিরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল, হাত ধরিয়া হেঁচ্কা দিল। বালিকা তবু নড়িল না। কিন্তু বালক নিরস্ত হইবার নয়। তাহার পীড়াপীড়ি উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। বালিকা বিরক্ত হইয়া ধমক দিল। অভিমানে বালকের মুখখানি ভার হইল, চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে বালিকার অন্তরের বিরক্তি গলিয়া জল হইয়া গেল। সস্নেহে বালককে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, লক্ষ্মীটী আমার– কেঁদোনা—একটুখানি দাঁড়াও। এক্ষুনি তোমায় নিয়ে যাব, এখন।

অভিমানী বালক চোখ মুছিতে মুছিতে অনুযোগের সুরে বলিল, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি!

বালিকার সারা মুখখানি সহসা ব্যথায় করুণ হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মুখে কথা ফুটিল না। একটু পরে যেন জোর করিয়া নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, আমাকে একটু জল খেতে দেবে না ভাই! একটু দাঁড়াও—এক ঢোঁক জল খেয়ে নিই।

সে এক পদ অগ্রসর হইয়া অঞ্জলি ভরিয়া ঝরণার জল পান করিল। কিন্তু এক ঢোঁক নয়,—যতক্ষণ পারিল, অঞ্জলির পর অঞ্জলি ভরিয়া আকণ্ঠ জল পান করিল। তাহার পর বেশ যেন একটু সবল হইয়া প্রফুল্ল মুখে বালকের হাত ধরিয়া বলিল, চলো।

উভয়ে পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল

২

মোগল-সম্রাট আকবর চিতোর অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। পরাজিত হৃতরাজ্য রাণা প্রতাপ আরাবল্লীর দুর্গম পাদমূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্গে স্ত্রী রাণী, কন্যা অশ্রুমতী, পুত্র অমরসিংহ এবং চল্লিশজন বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত অনুচর। উদ্দেশ্য—সংগোপনে শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি চিতোরের পুনরুদ্ধার করিবেন। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সর্ব্বস্ব—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। সংসারে এমন কোন কঠোরতা বা ত্যাগ-তপস্যা নাই—এই অভীপ্সিত মহাকার্য্যের জন্য যাহা তিনি বরণ করিতে না পারেন। অনাহারে অনিদ্রায় দুর্ব্বিসহ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়া তিনি এই কঠোর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। চোখের সম্মুখে প্রাণের প্রাণ পুত্র অন্নাভাবে মূর্চ্ছিত, নয়ন-পুত্তলী কন্যা অর্দ্ধমৃত, রাজরাজেশ্বরী সহধর্ম্মিনী অসহ কঠোর ব্রতের কঙ্কাল প্রতিচ্ছবি;—তথাপি সঙ্কল্পে অটল, কৃচ্ছ্র সাধনার মহাযোগী তিনি, জীবনের মহাব্রতকে দৃঢ়রূপে আঁকড়িয়া ধরিয়া মহা-সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ঈষৎ ঢলিয়া পড়িয়াছে। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মহারাণা কুটীর সম্মুখে ফিরিয়া অজিনাসনে স্তব্ধ হইয়া বসিলেন। স্বভাব-গম্ভীর শৌর্য্যদীপ্ত মুখমণ্ডল বিষাদের গাঢ়চ্ছায়ায় পরিম্লান। উৎকণ্ঠিত স্বরে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সংবাদ!

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রাণা উত্তর করিলেন, সংবাদ বড়ই অশুভ।—মোগল আমাদের সন্ধান পেয়েছে। শীঘ্রই তারা আরাবল্লীমুখে অভিযান কোরবে বোলে প্রস্তুত হোচ্ছে।

রাণীর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহোলে এখন কি কোর্‌বে?

—তা-ই ভাব্‌ছি। নিকটে আশ্রয়ের উপযুক্ত স্থানও নেই। অথচ এখানে থেকে মোগলের সম্মুখীন হওয়ার মত শক্তিও নেই।

রাণী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহারও মুখে চিন্তার গভীর ছায়া ঘনাইয়া আসিল। ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত বালক-বালিকা ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে সেইখানে আসিয়া দেখা দিল। ইহারা অমরসিংহ ও অশ্রুমতী।

রাণা ও রাণী উভয়েই মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পুত্র-কন্যার মুখের পানে চাহিয়া তাঁহাদের হারানো বাহ্যজ্ঞান যেন আবার ফিরিয়া আসিল।

অমর দুই বাহুতে জননীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, খেতে দাওনা মা, ক্ষিদে পেয়েছে যে!

রাণী পুত্রের মুখের পানে চাহিলেন। রাণাও চাহিলেন। উভয়েরই দৃষ্টি করুণ—বেদনায় ছল-ছল।

অশ্রুমতী সে-দৃষ্টির অর্থ বুঝিল। অমরের বাহু-বেষ্টন হইতে জননীকে মুক্ত করিয়া বলিল, চল, খাবে চল।

বালক উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অশ্রুমতী তাহার হাত ধরিয়া কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরে আহার্য্য নাই, কাজেই কোন বন্দোবস্তও হয় নাই। অমরের কথায় পিতামাতার মনে যে দুঃখ-বেদনার অতল সিন্ধু দুলিয়া উঠিয়াছে, অশ্রুমতী তাহা বুঝিয়াছিল; তাই আর সেখানে নূতন করিয়া ঝড়ের সৃষ্টি না করিয়া সে অমরকে দূরে সরাইয়া লইয়া গেল।

কন্যার মনোভাব বুঝিতে পিতামাতারও বাকী রহিল না। অসহ বেদনায় তাঁহাদের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত দুইজনেই নীরব। অবশেষে রাণা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, রাণি!

রাণী বিস্ফারিত দৃষ্টি তুলিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিলেন। রাণা আবার বলিলেন, রাণি, আমি সন্ধি কোর্‌বো।

রাণী উত্তর দিলেন না—বুঝি দিতে পারিলেন না। পূর্ব্ববৎ রাণার মুখের পানে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। এমন কথা আর কোনদিনই তিনি স্বামীর মুখে শুনেন নাই। বুঝি শুনিবার কল্পনাও করেন নাই। কাজেই তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অবশ্য কেন যে এই অসঙ্গত বাণী রাণার মুখ হইতে নির্গত হইল, তাহা বুঝিতে তাঁহার আদৌ বিলম্ব হইল না। কিন্তু আজ ত নূতন করিয়া এ-'কেন'র উদ্ভব হয় নাই, রাজ্য হারাইয়া পথচারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ত এ-ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক হইয়াছে। এমন দিনও ত গিয়াছে—যেদিন ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া অমর মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় লুটাইয়াছে, অশ্রু উত্থানশক্তি রহিত হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে। সেদিনও ত রাণার মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হয় নাই। কিন্তু আজ?—তবে সত্যই কি এতদিন পরে হিমালয় টলিল? কথাটা তাঁহার নিকট একটা দুর্ব্বোধ রহস্য বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু রহস্যের মায়াবরণ শীঘ্রই অপসারিত হইল। রাণা বলিতে লাগিলেন, আমি অনেক সহ্য কোরেছি রাণি, কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আর পারি না। অদম্য উদ্যম, দুর্ব্বার অধ্যবসায় নিয়ে সারা জীবন আমি লোড়ে এসেছি—কারণ, তখন আশা ছিল, ভরসা ছিল—চিতোরের যাহোক একটা কিনারা কোর্‌বো। কিন্তু এখন সে-আশা, সে-ভরসা আকাশ-কুসুমের মত মিলিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে উদ্যম,

অধ্যবসায়ও অন্তর্হিত হোয়েছে। তবে আর সহ্য কোর্‌বো কিসের বলে? সহ্য করবার সে প্রেরণা আর আমার মধ্যে নেই, আমি পার্‌বো না। আমি সন্ধি কোর্‌বো।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রাণী কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় চঞ্চল আনন্দ-নৃত্যে কুটীর হইতে বাহির হইয়া অমর তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। মুখের উপর মুখ রাখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, দিদি আজ খুব কোরে পেট ভোরে' খাইয়ে দিয়েছে। রাত্তিরে আর কিছু খেতে হবে না। হ্যাঁ মা, এত খাবার দিদি কোথায় পেলে?

অবোধ শিশু বুঝিল না, এ-রহস্য তাহারই মত মাতারও অজ্ঞাত।

অমরের কথায় মাতা-পিতা উভয়েই বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিলেন। আহার্য্য যাহা কিছু ছিল, রাত্রিতে সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, তবে কেমন করিয়া অশ্রু ইহাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিল। ঘটনাটা তাঁহাদের কাছে একটা মস্ত হেঁয়ালীর মত বোধ হইল। পুত্রের কথার কোন উত্তরই তাঁহারা দিতে পারিলেন না।

কিন্তু উত্তর পাওয়া না পাওয়ার জন্য অমরের অত মাথা ব্যথা ছিল না। উপস্থিত প্রয়োজন শেষ হইয়াছে, অনর্থক বোবার মত বসিয়া থাকা তাহার আর সহ্য হইল না। তাই জননীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া নাচিতে নাচিতে সে কুটীর-সীমান্ত ছাড়াইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাণা গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, রাণি!

—কি!

—অশ্রুকে একবার ডাক ত'।

—কেন?

— আমার বোধ হয় কাল রাত্রি থেকে সে অনাহারে আছে। আজকের উপবাস অনিবার্য্য জেনে নিজে অনাহারে থেকে বোধ হয় সে অমরের জন্য এই খাবার লুকিয়ে রেখেছিল।

এ কাজ অশ্রুমতীর পক্ষে যে আদৌ অসম্ভব নয়, রাণী তাহা বুঝিলেন। তাঁহার মনটা সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া উঠিল। ডাকিলেন, অশ্রু!

কিন্তু উত্তর আসিল না। আবার ডাকিলেন। উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষাও করিলেন। তথাপি উত্তর মিলিল না। উদ্বিগ্ন চিত্তে রাণী কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

রাণা যাহা সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। রাত্রি হইতেই অশ্রুমতী অনাহারে আছে। তাহাকে যে আহার্য্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহা না খাইয়া সত্যই সে অমরের জন্য সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল। কারণ, সে নিশ্চিত বুঝিয়াছিল, কাল সপরিবারে উপবাস ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু অমর ত উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না, ক্ষুদ্র বালক ক্ষুধায় কাতর হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহারই কাছে আসিয়া খাইতে চাহিবে। তাহার সেই ম্লান মুখ, কাতর কণ্ঠস্বর কল্পনা করিয়া ভ্রাতৃগতপ্রাণা ভগিনীর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আহার্য্য মুখে তুলিতে গিয়াও পারে নাই। তাই দুঃসহ ক্ষুধার ক্লেশ সহ্য করিয়া সমস্ত খাদ্য সে অমরের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিল। পাছে পিতা-মাতা তাহার এই অনাহারের কথা জানিতে পারেন, এই ভয়ে তাঁহাদের সম্মুখে সে কিছুমাত্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করে নাই বা গৃহে একবিন্দু জলও গ্রহণ করে নাই। দ্বিপ্রহরে ক্ষুধার তাড়না একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই সে ঝরণার জলে পেট ভরিয়া আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, ইহাতেই কোনও প্রকারে আজিকার দিনটা কাটাইয়া দিবে।

রাণী কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন অশ্রু নির্জ্জীবের মত ভূমিতে লুটাইয়া আছে। তাঁহার বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ডাকিলেন, অশ্রু!

অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকণ্ঠে অশ্রুমতী উত্তর দিল, মা!

রাণী কন্যার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়া পুনরায় ডাকিলেন অশ্রু—মা!

অশ্রুমতী চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

রাণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বড় কি ক্ষিদে পেয়েছে মা?

কন্যার মুখে শুষ্ক হাসির একটা ম্লান দীপ্তি ক্ষণিকের জন্য ফুটিয়া উঠিল। সে উত্তর দিল, না মা, আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি।

—তবে অমন কোরে আছ কেন মা!

—আমার অসুখ কোর্‌ছে।

রাণী নীরবে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, অমর কি খেয়ে গেল?

অশ্রুমতী চুপ করিয়া রহিল। রাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বল মা, তাকে কি খেতে দিলে?

একটু যেন ভয়ে-ভয়ে অশ্রুমতী বলিল, কাল থেকে আমার অসুখ-অসুখ কোর্‌ছিল, তাই কিছু খেতে পারিনি; সেই খাবার ছিল, তাই অমরকে খাইয়ে দিয়েছি।

রাণীর দুই চক্ষু বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু নামিয়া আসিল।

এদিকে রাণীর বিলম্ব দেখিয়া রাণা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। স্থির থাকিতে না পারিয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য তিনি কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনতিবিলম্বে সমস্ত রহস্যই প্রকাশ হইয়া পড়িল। একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রাণা বলিলেন, সাধে কি সন্ধির কথা তুলেছিলাম রাণী, এ দৃশ্য যে আর—

বলিতে বলিতে সহসা যেন রাণার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি অর্দ্ধপথেই থামিয়া গেলেন।

রাণী কোন কথা না বলিয়া নীরবে কন্যার চোখে মুখে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া রাণা হঠাৎ যেন উন্মাদের মত বলিয়া উঠিলেন, আমি চল্লুম রাণী, যতক্ষণ না ফিরি একে ধোরে রেখো—মোর্‌তে দিও না। আমি খাবার আন্‌তে চোল্লুম—খাবার আন্‌তে চোল্লুম।

রাণা দ্রুতবেগে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। রাণী অর্দ্ধোন্মাদ স্বামীর গন্তব্য পথের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না।

৩

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অশ্রুমতী একটু যেন সুস্থ হইয়া উঠিল। অবসন্নতা কাটিয়া যাওয়ায় সে উঠিয়া বসিল। রাণীরও বুকের উপর হইতে যেন একটা গুরুতর পাষাণ-ভার নামিয়া গেল। তিনি শোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

এতক্ষণ অনন্যচিত্তা হইয়া তিনি কন্যার শিয়রে বসিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বামী কোথায় গেলেন, কি করিলেন, ফিরিয়া আসিলেন কিনা এ চিন্তার অবসর তাঁহার আদৌ হয় নাই। এখন কন্যাকে একটু সুস্থ দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার স্বামীর কথা মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু কি করিবেন, কেমন করিয়া খোঁজ লইবেন, নিকটে তেমন কেহ নাই যে, তাহাকে ডাকিয়া খোঁজ করিতে বলিবেন। এক উদ্বেগ না যাইতে দ্বিতীয় উদ্বেগ আসিয়া তাঁহার মনকে অস্থির করিয়া তুলিল।

এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, মা!

রাণী উৎকর্ণ হইলেন।

আবার সেই কণ্ঠস্বর !

'ব্যস্ত-সমস্ত' ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেই রাণী দেখিলেন, সম্মুখে বলবন্ত সিংহ। তাহার হাতে ভূর্জ্জপত্রে খাদ্য-সামগ্রী। বিনীত স্বরে বলিল, মা, খুকুমণির খাবার।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় রাণীর সমগ্র অন্তর্দ্দেশ ভরিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাণা কোথায়?

—তা'ত জানি না মা! তবে মনে হয় তিনিও আহার্য্য সংগ্রহে বেরিয়েছেন।

—তুমি যে আহার্য্য এনেছ, তা' কি তিনি জানেন না?

—না মা, তা কেমন কোরে জান্‌বেন। দেখ্‌লুম পাগলের মত তিনি অ-পথ বি-পথ ভেঙে চোলেছেন। জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লুম, খুকুমণি দু'দিন অনাহারে, কথা কইবার শক্তি নাই, তাই তাঁর জন্য আহার্য্য সংগ্রহে চোলেছেন।

—তুমি তাঁকে ফিরালে না কেন ?

—কেমন কোরে ফিরাব মা! আমার কাছে ত আহার্য্য মজুদ ছিল না। তা' যদি থাক্‌তো, তাহোলে আর আমি তাঁকে যেতে দিতুম না। তিনি চোলে যেতে ভাব্‌লুম, কি জানি তিনি সংগ্রহ কোর্‌তে পারেন কি না পারেন তার ত ঠিক নাই, যদি বিফল হ'ন, তা হোলে ত সর্ব্বনাশ হবে। সাত পাঁচ ভেবে তখন নিজেই বেরিয়ে পোড়্‌লুম। শেষ পর্য্যন্ত ভগবান মুখ রেখেছেন মা! ভীল-পাড়ার ভিতর থেকে তিনি এই খাবারটুকু মিলিয়ে দিয়েছেন।

—বলবন্ত! তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার ভাষা আমার নেই। এ সুকৃতির পুরস্কার স্বয়ং ভগবানই তোমায় দেবেন। এখন যাও বাপ, এতই যদি কোরেছ, তবে আর শেষটুকু বাকী থাকে কেন ? তোমার রাণাকে খুঁজে এনে দাও। মেয়ের অবস্থা দেখে তিনি পাগলের মত ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছেন। লক্ষ্যহারা দিক্‌-ভ্রান্তের মত এতক্ষণ কোথায় কি কোর্‌ছেন, কার দ্বারে গিয়ে হাত পাতছেন,—কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। চারদিকে শত্রু, এর ভিতর—

বাধা দিয়া বলবন্ত বলিল, আর বোল্‌তে হবে না মা, আমি এখুনি যাচ্ছি। যেখান থেকে পারি, তাঁকে খুঁজে আন্‌ছি।

দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা না করিয়া বলবন্ত দ্রুতবেগে কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাণী কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মন নিরতিশয় উচাটন হইয়া উঠিল। চারিদিকে শত্রুর চর ঘুরিতেছে। নিঃসহায় একক স্বামী উন্মাদের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। যদি কোনও প্রকারে—

অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পত্রসমেত খাদ্যসামগ্রী অশ্রুমতীর সম্মুখে ধরিয়া দিয়া তিনি নিজেও ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অসহ্য ক্ষুধার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্রুমতীর সর্ব্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। মাঝে মাঝে চক্ষু আঁধার হইয়া আসিতেছিল। অতি কষ্টে সোজা হইয়া বসিয়া সে আহার্য্যগুলি কোলের কাছে টানিয়া লইল।

ঠিক সেই সময়ে বাহিরে অপরিচিত কণ্ঠের স্বর শোনা গেল। অশ্রুমতী উৎকর্ণ হইল। আবার সেই স্বর। অশ্রুমতী বুঝিল, অতিথি। তাহার আর আহার হইল না। কোন প্রকারে উঠিয়া অজিন আসনখানি হাতে লইয়া বাহিরে আসিল। এবং যথারীতি অতিথির সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাহাকে বসিতে দিল।

অতিথি আসন গ্রহণ করিয়া দুই একটী প্রশ্নে অশ্রুমতীর পরিচয় জানিয়া লইল। উপস্থিত তাহার পিতামাতা যে গৃহে নাই, ইহাও জানিতে তাহার বাকী রহিল না।

প্রশ্নোত্তর শেষ হইলে অতিথি জানাইল, সে ক্ষুধার্ত্ত। সমস্ত দিন তাহার আহার হয় নাই।

অশ্রুমতী টলিতে টলিতে কুটীর-মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল এবং তাহার জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় আহার্য্য সামগ্রীগুলি আনিয়া অতিথির সম্মুখে ধরিয়া দিল।

অতিথি আহারে বসিল। অশ্রুমতী গৃহের ভিতর যাইবার জন্য এক পা' এক পা' করিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারিয়া উঠিল না। দরজা পর্য্যন্ত যাইয়াই অতি-শ্রান্তিতে সে বসিয়া পড়িল এবং পরক্ষণে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল।

অতিথি আহারে বসিলেও এদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল। হঠাৎ অশ্রুমতীকে লুটাইয়া পড়িতে দেখিয়া সে আহার ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

—অশ্রু!

সহসা উদাত্ত আকুল কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—অশ্রু!

বিস্মিত অতিথি বিস্ফারিত দৃষ্টি তুলিয়া সম্মুখে চাহিল। দেখিল, দীর্ঘ গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত এক বিরাট পুরুষ। হস্তে ভূর্জ্জপত্রে আহার্য্য বস্তু। প্রথম দৃষ্টিতেই অতিথি মহারাণা প্রতাপকে চিনিল। শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে তাহার মনটা যেন নত হইয়া আসিল।

রাণা কিন্তু অতিথিকে লক্ষ্য করিলেন না। দ্রুতপদে কুটীরের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এ কি! অশ্রু! এখানে! এমন অবস্থায়! তাঁহার বুক ফাটিয়া কান্না জাগিল। গভীর আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিলেন, অশ্রু—মা আমার!—

কোথায় অশ্রু? কে উত্তর দিবে? শৈল-প্রকৃতির পাষাণ-বুকে সে আর্ত্তস্বর প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

* * * * *

সন্ধ্যার ছায়া তখন নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। স্তব্ধ শোকাহত মহারাণা কন্যার শব-পার্শ্বে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। অতিথি কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ হইতে আর্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, মহারাণা!

মহারাণা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দৃষ্টি করুণ—সজল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার দুই চক্ষু অস্বাভাবিকরূপে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অতিমাত্র বিস্ময়ে তিনি অভিভূতের মত বলিয়া উঠিলেন, সম্রাট!

উত্তর হইল, আর সম্রাট নই—অতিথি। মহারাণা, এ দৈবের নির্ব্বন্ধ—খণ্ডন করবার উপায় নাই। অতিথির ছদ্মবেশ ধোরে আমিই এই সোনার প্রতিমাকে অকালে মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছি, বুঝ্‌তে পারিনি যে এ অভুক্ত ছিল। মহারাণা, আমার প্রায়শ্চিত্ত?

মহারাণার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস উঠিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি গভীর কণ্ঠে ডাকিলেন, সম্রাট,—

বাধা দিয়া সম্রাট বলিলেন, বোলেছি ত ভাই, আর আমি সম্রাট নই—অতিথি। ও সম্বোধনে আর আমায় লজ্জা দেবেন না।

মহারাণা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, উত্তম—আসন গ্রহণ করুন।

—কোরবো, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি একটা প্রতিশ্রুতি চাই।

আর একবার মহারাণা প্রতাপের বিস্মিত দৃষ্টি সম্রাট আকবরের মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি প্রতিশ্রুতি?

—প্রতিশ্রুতি চাই যে—আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কোর্‌বেন।

প্রার্থনা! রাণার প্রদীপ্ত ললাটে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিয়া অবশেষে বলিয়া উঠিলেন, উত্তম, কি প্রার্থনা বলুন।

—প্রার্থনা আপনার বন্ধুত্ব—আপনার হৃদয়।

মুহূর্ত্তের মধ্যে কি যেন একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। মহারাণা ডাকিয়া উঠিলেন, সম্রাট!

—আর সম্রাট নই—ভাই। মহারাণা,—প্রতাপসিংহ!

বলিতে বলিতে সম্রাট বাহু-বেষ্টনে রাণাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। রাণাও প্রতি-আলিঙ্গন দিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিলেন। নির্জ্জন শৈলের পাষাণ-ক্রোড়ে চিতোর-কুললক্ষ্মীর শবপার্শ্বে ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ শক্তির আকস্মিক সম্মিলন। অপূর্ব্ব—অভিনব—কল্পনাতীত। আকাশে সন্ধ্যাতারা হাসিল। তাহার মৌন আশীর্ব্বাদ আলিঙ্গনবদ্ধ সেই যুগল বিরাট পুরুষের মাথার উপর নীরব ধারে নামিয়া আসিল।

ইজ্জতের দায়

১

নায়েবের অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিয়া জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে হাতেম যখন গৃহে ফিরিল, তখন দিবালোকের শেষ রশ্মি গাছের মাথা হইতে সরিয়া গিয়াছে। স্ত্রী জরিনা অনাহারে অনিদ্রায় দুই হাত তুলিয়া খোদার কাছে দোওয়া মাগিতেছিল, তাই স্বামীকে পাঁচিলের দরজায় পা দিতে দেখিয়াই তাহার বুকখানা যেন দশ হাত হইয়া উঠিল। সে এক রকম ছুটিয়া রোয়াক হইতে উঠানে আসিয়া পড়িল। কিন্তু আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। স্বামীর সর্ব্বশরীরে নির্ম্মম অত্যাচারের জ্বলন্ত চিহ্ন ফুটিয়া আছে। জরিনা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া কোন রকমে ঘরের মধ্যে লইয়া শোয়াইয়া দিল।

তিন বৎসরের উপর্যুপরি অজন্মার ফলে সমস্ত পরগণায় হাহাকার জাগিয়া উঠিয়াছে। দিন-মজুর যাহারা, তাহাদের ত কথাই নাই; দুই দশ বিঘা জমিজমা যাহারা রাখে, তাহাদের অবস্থাও মর্ম্মান্তিক। হাতেম এই শেষোক্ত শ্রেণীরই পল্লী-গৃহস্থ। তিন বৎসরের দৈব-বিড়ম্বনায় সে

সর্ব্বস্বান্ত—পেটের ভাত জোটাতেই পারিতেছে না, জমীদারের দাবী পূরণ করিবে কোথা হইতে? অবস্থা সকলেরই সমান, দুই পাঁচ বিঘা জমী বন্ধক রাখিয়া যে টাকার যোগাড় করিবে, সে উপায়ও নাই। কাজেই তিন বৎসরের মধ্যে খাজনা বাবদ একটী পাই পয়সাও দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে নাই। এদিকে দুর্দ্দান্ত জমীদার, ততোধিক দুর্দ্দান্ত তাহার নায়েব। এ অবস্থায় সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিয়াছে। গত দুই দিন ধরিয়া হাতেম, নায়েবের হুকুমে কাছারীতে আবদ্ধ ছিল। মারপিট অত্যাচারও তাহার উপর যথেষ্ট চলিয়াছিল। শেষে তিন দিনের মধ্যে যেমন করিয়াই হউক, হাল খাজনা পর্য্যন্ত শোধ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সে প্রাণ লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছে।

রাত্রি প্রায় একটার সময় হাতেমের ঘুম ভাঙিয়া গেল। জ্বরের প্রকোপ তখন অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছিল। সে চোখ মেলিয়া দেখিল ঘরের মধ্যে তখনও মিট্ মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে—আর জরিনা শিয়রে বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইতেছে। সে কাতর কণ্ঠে ডাকিল,—জরিনা।

—কি!

—তুমি এখনও জেগে বোসে আছ?

—হ্যাঁ—তুমি ঘুমোও। রাত জাগ্‌লে আবার জ্বর বাড়্‌বে।

—আর বাড়্‌বে!

একটা টানা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাতেম অতিকষ্টে পাশ ফিরিয়া শুইল।

জরিনা নীরবে স্বামীর বেদনা-ক্লিষ্ট পীড়িত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কি একটা কথা বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না, বুঝি কান্নায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরব। শেষে হাতেম আর্ত্তকণ্ঠে আবার ডাকিয়া উঠিল—জরিনা!

জরিনা পূর্ব্ববৎ উত্তর দিল—কি!

—এখান থেকে চোলে যেতে পারবে?

—ওসব কথা এখন থাক্। ও নিয়ে আর এখন মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই। আগে ভাল হোয়ে ওঠো, তারপর যা' হয় করা যাবে।

—ভাল হোয়ে উঠ্‌বো!

কথাটা শ্লেষাত্মক বটে, কিন্তু বড় করুণ এবং হাতেমের কণ্ঠে তাহা আর্ত্তনাদের মত ফুটিয়া উঠিল। জরিনার দুই চক্ষে বড় বড় দুইটী অশ্রুর ফোঁটা ম্লান দীপালোকে মুক্তা বিন্দুর মত ঝকিয়া উঠিল। সে কথা বলিতে পারিল না।

হাতেম আবার জিজ্ঞাসা করিল—কিছু বোল্‌লে না যে?

করুণ কণ্ঠে জরিনা বলিল—কি!

—এখান থেকে চোলে যেতে পারবে? আর সহ্য কোর্‌তে পারি না।

—তা-ই যদি ভাল মনে কর,—তাহোলে যাবনা কেন? কিন্তু এখন সে কথা থাক,—একটু ঘুমোও, কাল সকালে উঠে যাহোক্ একটা ঠিক করা যাবে।

—বেশ সেই ভাল।

হাতেম চুপ করিল। জরিনা পূর্ব্বের মতই শিয়রে বসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

২

হাতেম পিতৃমাতৃহীন এবং নিঃসন্তান। কাজেই তাহার সংসারে সে এবং জরিনা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না।

নিঃসন্তান হওয়াটা তাহার পক্ষে বিধাতার অভিসম্পাত কি আশীর্ব্বাদ তাহা বুঝিয়া উঠাটা ঠিক সহজ ব্যাপার ছিল না। কারণ, এ সম্পর্কে তাহাদের উভয়কেই যেন উদাসীন বলিয়া মনে হইত। পুত্রকন্যা হইলে তাহারা যে বিশেষ সুখী হইত কিম্বা না হওয়ার দরুণ এখন যে বিশেষ দুঃখিত, তাহাদের কথা-বার্ত্তায় আচার-ব্যবহারে বা চাল-চলনে তাহা মোটেই বুঝা যায় না।

পিতার আমলের যে দুই দশ বিঘা জমি ছিল, তাহাই 'চাষবাস' করিয়া হাতেম কোনও রকমে দিনপাত করিত। পরিশ্রমে কোন দিন সে 'পিছ-পাও' ছিল না। স্বাস্থ্য-সুন্দর সবল দেহখানিই ছিল তার সম্বল এবং সেই 'সম্বলের' বলেই সে অহোরাত্র অসুরের মত পরিশ্রম করিয়া যাইত। জরিনাও ছিল পতির উপযুক্ত পত্নী। তাহার যৌবন-সুন্দর সুগোল সুঠাম অথচ বলিষ্ঠ দেহে স্বামীরই মত অসাধারণ কর্ম্মশক্তি নিহিত ছিল। কাঠ-চেলা, ধান-ভানা হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর-সংসারের সমস্ত খুঁটী নাটী কাজই সে নিজের হাতে করিয়া যাইত। এ-সবের জন্য হাতেমকে আদৌ মাথা ঘামাইতে বা বেগ পাইতে হইত না। শুধু মাঠের কাজ লইয়াই সে ব্যস্ত থাকিত। সমস্ত দিনের হাড়-ভাঙা খাটুনীর পর সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত দেহখানি লইয়া সে যখন বাড়ী ফিরিত, তখন দেখিত ঘরে মাটীর প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহারই প্রতীক্ষায় সন্ধ্যালক্ষ্মীর মত দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া জরিনা। কোমল লাবণ্যে ঢল-ঢল সেই হাসি-হাসি

মুখখানি—স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টিমাখা, সুনীল-সায়রে-ফোটা সেই কমল আঁখি দু'টী·········হাতেমের সর্ব্ব ক্লান্তি সর্ব্ব অবসাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন যাদুমন্ত্রে কোথায় উড়িয়া যাইত। অভিনব আনন্দ-প্রেরণায় তাহার সমস্ত দেহ-মন যেন উজ্জীবিত হইয়া উঠিত।

এই ভাবে দিন কাটিতেছিল। সহসা অজন্মা-রাক্ষসী আসিয়া তাহার বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া বসিল। শান্তিময় সংসার-জীবনের উপর প্রলয়-ঝঞ্ঝার ঝঙ্কার-রোল বাজিয়া উঠিল।

* * * * *

খানিকটা বেলা হইয়াছে। হাতেম বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে রোয়াকের উপর আসিয়া বসিয়াছে, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, হাতেম বাড়ী আছ?

—কে?

—আমি শান্তিরাম, একবার বাইরে এস ত।

জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের বেদনা একটুও কমে নাই। কাজেই বেশী চলা-ফেরা করা হাতেমের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল। তথাপি সে আগন্তুককে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। এটা একেবারেই তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। সে জবাব দিল, বোসো দাদা—যাচ্ছি।

কথা শেষ করিয়াই হাতেম উঠিবার উপক্রম করিল। জরিনা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। বাধা দিয়া বলিল, ওগো, এই দেহ নিয়ে আর যায় না। বোলে দাও—অন্য সময় গিয়ে দেখা কোরে আসবো।

হাতেম একটা শুষ্ক ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, বাড়ী পর্য্যন্ত কষ্ট কোরে এসেছে, দেখা না-করাটা কি ভাল দেখায়? তাহার পর একটু

খানি থামিয়া বলিল, তুমি সেই ছোট লাঠিটা এনে দাও দেখি, একটা কিছুতে ভর না দিলে যেতে পারবো না।

রাগে অভিমানে মুখখানি ভার করিয়া জরিনা বলিল, তবু যেতে হবে?

পূর্ব্ববৎ হাসিয়া হাতেম বলিল, কি কোর্‌বো জরি, মানুষ বাড়ীতে এসেছে—

বাধা দিয়া জরিনা বলিয়া উঠিল, থাক্ হোয়েছে, আর বোল্‌তে হবে না।

ছোট লাঠি গাছটী আনিয়া স্বামীর পাশে রাখিয়া সে ক্ষুব্ধ অভিমানে রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

হাতেম আর একবার ম্লান হাসি হাসিল। তাহার পর লাঠির উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে জরিনা রান্নাঘর হইতে স্বামীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। সে উৎকর্ণ হইল। সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইল—হারামজাদা, শয়তান, পাজী!—

জরিনা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া বাহিরে—একেবারে পাঁচিলের দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। উঁকি মারিয়া দেখিল, আগন্তুক তখনও দাঁড়াইয়া। তাহার মুখে একটা হিংস্র ক্রূর হাসি।

বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া হাতেম বলিয়া উঠিল, এখনও দূর হ' বল্‌ছি, নইলে তোর মুণ্ডু ছিঁড়ে নেব।

আচ্ছা—

সেই ক্রূর হাসি মুখে লইয়া আগন্তুক ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

হাতেম ঠিক দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল। জরিনা তাহার হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল। মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহা রক্তের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটী আগুনের গোলার মত ধক্

ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। হাত দুইটী দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ। চিরশান্ত সহনশীল স্বামীর এই উন্মাদ মূর্ত্তি দেখিয়া জরিনার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল। কোনরূপে আত্মসংবরণ করিয়া সে তাহাকে ধরিয়া ঘরের দিকে লইয়া চলিল। হাতেমও আপত্তিমাত্র না করিয়া যন্ত্রচালিতের মত পত্নীর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের রোয়াকে গিয়া উঠিল।

রোয়াকে উঠিয়াই হাতেম আধ-ভাঙা জলচৌকীখানির উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ভিতরে গিয়া শুইতে বলায় সে ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

একদিন নয়, দুইদিন নয়—আজ দীর্ঘ দশ বৎসর কাল জরিনা স্বামীর ঘর করিতেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একদিন এক মূহুর্ত্তের জন্তও সে স্বামীকে রাগিতে বা রূঢ় কথা বলিতে দেখে নাই বা শোনে নাই। স্বামী যে রাগ করিতে বা রূঢ় কথা বলিতে পারে বা জানে, এ ধারণাই তাহার ছিল না। আজিকার এ অভিজ্ঞতা তাহার পক্ষে একান্ত আকস্মিক—অপ্রত্যাশিত। ইহা তাহার মনের মধ্যে একটা আসন্ন অমঙ্গলের গুরু-আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিল। সে বেশ বুঝিতে পারিল, সামান্ত কারণে এ হিমাচল টলে নাই; নিশ্চয় একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়াছে। কিন্তু সে 'কিছু' যে কি, তাহা সে ধারণায় আনিতে পারিল না।

স্বামীর পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে সে সহানুভূতি-ভরা কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হোয়েছিল, ওকে অমন কোরে বোক্‌ছিলে কেন?

হাতেম উত্তর দিল না। একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে একবার হুঁ শব্দ করিল মাত্র।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জরিনা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, ও বোল্‌ছিল কি ?

হাতেম সহসা মাথা তুলিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিল। উন্মাদের মত বলিয়া উঠিল—জরি, এখনি এখান থেকে চল। আর দেরী না, এক লহমাও না।

বলিতে বলিতে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার বশে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জরিনা যেন 'থতমত' খাইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া স্বামীর ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কি হোয়েছে খুলে বল, আমি যে কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না।

—বুঝতে পার্‌ছো না ? নায়েবের দূত এসেছিল—তোমাকে নায়েবের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য উপদেশ দিতে। তা' যদি দিতে পারি, তবেই আমার রেহাই, নইলে বুকে বাঁশ ডোলে, মুখে রক্ত তুলে আমাকে শেষ কোর্‌বে—বুঝ্‌লে ?

বলিতে বলিতে হাতেমের দুই চোখে শীকার-লোলুপ বাঘের হিংস্র দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

জরিনা স্বামীর উত্তরের শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইল না। তাহার মাথার ভিতর এক সঙ্গে সহস্র ঝিল্লী ডাকিয়া উঠিল। সর্ব্বশরীর অসাড় হইয়া আসিল। সে সেইখানেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

হাতেম কিন্তু তাহার দিকে লক্ষ্যও করিল না। সে যেন উন্মাদ। মাতালের মত টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে গিয়া সামান্য আসবাবপত্র যাহা কিছু ছিল, বাহিরে টানিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর একটা বিকৃত আর্ত্ত-চীৎকারে একান্ত অবসাদ-ভারে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

৩

দুই প্রহরের কিছু আগে কাছারীর জন কয়েক পাইক আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে হাঁক ডাক জুড়িয়া দিতে হাতেম চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তাহার সমস্ত শরীর তখন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। এতক্ষণ সে ঘুমাইয়াছিল কি জাগিয়াছিল, কিছুই যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। সকাল বেলা-কার ঘটনাটা তাহার কাছে একটা স্বপ্নের মত মনে হইলে লাগিল। কিন্তু এসব বিষয় চিন্তা করিবার তাহার বিশেষ অবসর ঘটিল না। পাইক-দের হাঁকাহাঁকি তাহার চিন্তার মাঝে ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল। সে প্রথমটা ঠিক করিতে পারিল না, বাহিরে কিসের হাঁকাহাঁকি বা গণ্ডগোল চলিতেছে; কিন্তু যখন সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইল যে, কাহারা তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতেছে, তখন সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পাঁচিলের দরজা খোলা ছিল। সেই খোলা দ্বারপথে রোয়াক হইতে নীচু হইয়া উঁকি মারিতেই হাতেমের ভ্রম ঘুচিয়া গেল। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যেটাকে সে স্বপ্ন মনে করিতেছিল, সেইটাই এখন কঠোর বাস্তবের মূর্ত্তি লইয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার ভিতরের সুপ্ত সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন এক যাদুমন্ত্রে তাহার দেহের সর্ব্ব অবসাদ গ্লানি কোথায় উড়িয়া গেল। অসহ ক্রোধে সে চালের 'বাতা' হইতে বাঁশের লাঠিটা পাড়িয়া তাহাকে সজোরে মেঝের উপর ঠুঁকিয়া এক লাফে উঠানের মাঝখানে গিয়া পড়িল। অকস্মাৎ ঝড়ের মত আসিয়া জরিনা দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাহার গতিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। হাতেম গর্জ্জন করিয়া

বলিল, পথ ছাড় জরিনা—আজ আমারি একদিন কি ওদেরি একদিন।

জরিনাও মরিয়া হইয়া আসিয়াছিল। সে যথাশক্তি লাঠিসমেত স্বামীর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না তুমি যেতে পাবে না, —আমি যেতে দেব না।

জরিনার কথা শেষ হইতে না হইতেই পাঁচ সাতজন পাইক 'হুড় হুড়' করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। জরিনা এতদূর কল্পনাও করে নাই। কাজেই বে-ইজ্জতির ভয়ে সে স্বামীর সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। হাতেম 'মরিয়া' হইয়া পাইকদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহার যমদণ্ড-সদৃশ লাঠি তুলিল, কিন্তু জরিনার নিষেধ-ইঙ্গিতে সেই উত্তোলিত লাঠি পর-মুহূর্ত্তেই নামিয়া আসিল। কেশরী বাগুরাবদ্ধ হইল। পাইকদল আর কাল বিলম্ব না করিয়া বিজয় গর্ব্বে বন্দীকে লইয়া কাছারীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

জরিনা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিল। বাধা দিল না বা সাহায্যের জন্য কাহাকেও চীৎকার করিয়া ডাকিল না। নিরপেক্ষ দর্শকের ন্যায় সমস্তই নীরবে দেখিল। আজ চক্ষু তাহার মরুভূমি, সেখানে একবিন্দু জল নাই; মুখে তাহার অসীম ঔদাস্য, মমতা বা অনুকম্পার ছায়া মাত্র সেখানে নাই। আর অন্তর? সেখানে বুঝি শূন্য নৈরাশ্যের অসীম ছায়া, আশার অস্পষ্ট ক্ষীণ আলো-রেখাও বুঝি চিরতরে মুছিয়া গিয়াছে।

৪

গ্রামের সকলেই প্রায় শশব্যস্ত। হাতেমের উপর যে অত্যাচার হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, সে অত্যাচার যে-কোন মুহূর্ত্তে যে-কোন লোকের উপর যে হইতে পারে, একথা গ্রামের ছেলে মেয়ে বুড়ো সকলেই বুঝিল। কাজেই সকলেই সশঙ্ক এবং পাছে কোন রকম দোষ ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে হাতেমের উপর এতখানি অত্যাচার হওয়া সত্ত্বেও কেহ তাহার হইয়া মুখে 'রা' শব্দটী উচ্চারণ করিল না। এমন কি দু'পর বেলায় এই অমানুষিক কাণ্ড হইয়া যাওয়ার পরও তাহার স্ত্রীর কি অবস্থা হইল—সে মরিল কি বাঁচিল, এ খবরটাও কেহ লইল না। কে জানে যদি হিত করিতে গিয়া বিপরীত ঘটিয়া বসে।

* * * * *

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। বেশ একটু রাত্রি হইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ একটা গোঙানির সঙ্গে অস্ফুট আর্ত্ত চীৎকার শুনিয়া জনৈক 'পথ চল্‌তি' প্রতিবেশী পাঁচিলের খোলা দরজা দিয়া হাতেমের বাড়ীর মধ্যে ভয়ে ভয়ে একবার উঁকি মারিল। কিন্তু উঁকি মারিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। উঠানের মাঝখানে দাউ দাউ করিয়া আগুণ জ্বলিতেছে, আর সেই আগুণের ভিতর হইতেই গোঙানির সঙ্গে অস্ফুট আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছে। ইজ্জৎ রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া জরিনা কেরোশিনের আগুণে আত্মাহুতি দিয়াছে। প্রতিবেশী উচ্চ চীৎকারে সকলকে ডাকিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় আগুণ নিভাইয়া ফেলিল বটে; কিন্তু অভাগিনীকে আর ফিরিয়া পাওয়া গেল না। আগুণ নিভিবার

পূর্ব্বেই তাহার পুণ্য আত্মা কলুষ দৃষ্টির সীমা ছাড়াইয়া বহুদূরে চলিয়া গেল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে একথা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পল্লী একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেন শিহরিয়া উঠিল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় দুইজন পাইক হাতেমকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল। সংবাদ শুনিয়া নায়েব স্বেচ্ছায় তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। না দিবেই বা কেন, যাহার জন্য এত করা, সে-ই যখন চলিয়া গেল, তখন আর ইহাকে আট্‌কাইয়া রাখায় লাভ কি ?

হাতেম ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উঠানের মাঝখানে—যেখানে জরিনার শবদেহ ঘেরিয়া প্রতিবেশীরা বসিয়াছিল, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বিস্ফারিত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে পত্নীর বিকৃত মুখের পানে চাহিল। সহসা একটা আর্ত্ত চীৎকারে উপস্থিত সকলেই চমকিয়া উঠিল। যখন চমক ভাঙিল, তখন দেখিল, উন্মাদ হাতেম মৃতা পত্নীর দগ্ধ শব বুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে।

প্রায়শ্চিত্ত

১

বন্দেমাতরম !

কলিকাতার——ষ্ট্রীটের দীনেশদের প্রাসাদতুল্য বাড়ীর দো-তালার ঘরে দীনেশ ও তাহার বন্ধু রশীদ কি একটা তর্কে মশ্‌গুল ছিল, এমন সময়ে বাহিরে রাস্তার উপর সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—বন্দেমাতরম !

দীনেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। প্রায় পাঁচ শত সুশিক্ষিত সত্যাগ্রহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের বুকে অদম্য উৎসাহ, মুখে অনম্য দৃঢ়তা, চোখে প্রশান্ত ভাস্বর দীপ্তি। রাস্তার দুই পার্শ্বে ভিড় করিয়া লোক জমিয়াছে—মুক্তি-সংগ্রামের সেই অজেয় সৈনিকদলকে অভিনন্দন দিতে, প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিতে।

একা দেখিয়া দীনেশের বোধ হয় তৃপ্তি হইল না। তাই রশীদকে ডাকিয়া কহিল,—আরে দেখ্‌লে না, শীগ্‌গির এসো, চোলে গেল যে।

ঔদাস্যের সুরে রশীদ উত্তর দিল, যাক্‌গে।

সে যেমন বসিয়া ছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। দীনেশ আর তাহাকে ডাকিল না। সে দেখিতে লাগিল—মুক্তি-সংগ্রামের যাত্রীদলের সেই

প্রাণস্পর্শী অপূর্ব্ব শোভাযাত্রা। তাহার দৃষ্টি সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ, অন্তর ভাব-প্রেরণায় ভরপুর।

শোভাযাত্রা চলিয়া গেল। দূরে—দূরে—আরো দূরে। যখন দৃষ্টি পথের একেবারে বাহিরে গিয়া পড়িল, তখন দীনেশ তাহার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া অনুযোগের সুরে বন্ধুকে বলিল, তোমার সঙ্গে আজ ঝগড়া কোর্‌বো আমি।

একটু যেন ম্লান হাসি হাসিয়া রশীদ বলিল, কেন ?

—কেন, তা' আবার জিজ্ঞাসা কোর্‌ছ ? দেশের মধ্যে এত বড় একটা ব্যাপার আরম্ভ হোয়েছে, আর তার প্রতি তোমার এতটুকু সহানুভূতি নেই ?

—কেমন কোরে জান্‌লে—সহানুভূতি নেই ?

—এততেও জান্‌তে বাকী থাকে ? ঘরের পাশ দিয়ে সব চোলে গেল, আর তুমি একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখাও দরকার বোলে মনে কোর্‌লে না।

রশীদ পূর্ব্বের মতই শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, চোখ তুলে চাইলেই বুঝি সহানুভূতি দেখানো হয় আর না চাইলেই—

কথাটা শেষ না করিয়াই হঠাৎ কি ভাবিয়া রশীদ বলিয়া উঠিল, যাক্, এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই ভাই, এখন অন্য কথা বলো।

দীনেশ নাছোড়বান্দা। সে বলিয়া উঠিল, অমন ধামা চাপা দেওয়া চোল্‌বে না। তোমার কি argument আছে দেখাও, প্রমাণ করো যে এই movement এর প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে।

—না হয় মনে করো নেই।

অমন অসঙ্গত কথাই বা মনে কোর্‌বে কেন ভাই—

রশীদ ও দীনেশ উভয়েরই দৃষ্টি ঘরের দরজার পথে নিবদ্ধ হইল। সহসা দীনেশ এক প্রকার লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, এই যে দিদি, দেখো ত দিদি, কি অন্যায়! সোজাসুজি বোলে বোস্‌ল কিনা না হয় মনে করো নেই? বোলতে একটু আট্‌কালোও না।

দিদি তাঁহার স্বাভাবিক গম্ভীর মুখখানি তুলিয়া রশীদের পানে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন, ঠিকই ত ভাই, এমন কথা কি মুখে তুলে বোলতে আছে?

রশীদ প্রথমটা যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। পরে কোন রকমে সে ভাবটা কাটাইয়া বলিল, কি কোর্‌বো, ও যে নাছোড়বান্দা।

—তা'তে তো ওর দোষ দেওয়া যায় না ভাই, কাজ দেখেই মানুষ মানুষের অন্তরের বিচার করে। আমি ওঘর থেকে সবই দেখেছি। processionটা যখন এলো, তখন ও ছুটে জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু তুমি রইলে চুপটী কোরে বোসে। এর জন্য যদিও তোমার ভিতরে sympathyর অভাব বুঝে থাকে, তাহোলে ত ওকে দোষী করা চলে না।

—দোষী তো করিনি। শুধু ওর জুলুমের চোটে কথাটা বোলতে বাধ্য হোয়েছি।

কথাটা শেষ করিয়া রশীদ একবার দিদির মুখের পানে চাহিল। কিন্তু পরক্ষণেই আপনা হইতেই যেন তাহার মাথাটা নীচু হইয়া আসিল। দিদি বলিলেন, যাক্‌, তাহোলে আর বাড়াবাড়ি—ঝগড়া ঝাঁটি কোরে কাজ নেই।

দীনেশ বলিয়া উঠিল, ঝগড়া আমি কোরবই—যদি না ও-কথাটা প্রত্যাহার করে।

দিদি আবার একটু হাসিলেন। তাহার পর রশীদকে বলিলেন, আচ্ছা ভাই, তুমি কথাটা প্রত্যাহারই করো নইলে ও পাগল ত শুনবে না।

—বেশ, তাই হোক, আমি প্রত্যাহার কোর্‌ছি।

—আমিও মাপ চাইছি—

বলিয়াই দীনেশ আসন হইতে উঠিয়া হাত বাড়াইল। রশীদও বাড়াইল। বন্ধুতে বন্ধুতে করমর্দ্দন হইয়া সকল তর্ক বিতর্ক ও ঝগড়া ঝাঁটির অবসান হইল।

২

দীনেশ ও রশীদের বন্ধুত্ব ছেলেবেলা হইতে। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে যে পরিচয় ও বন্ধুত্বের সঞ্চার হইয়াছিল, সেই পরিচয় ও বন্ধুত্ব আজ গাঢ় হইয়া এই দুইটী ভিন্ন ধর্ম্মী ও ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেকে যেন অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছে। পাশাপাশি দুইখানি বাড়ীতে এই দুইটী পরিবারের বাস, সুতরাং দীনেশ ও রশীদ ছাড়া পরিবার দুইটীর প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। তবে দীনেশ ও রশীদের মধ্যে যে পরিচয়, সে পরিচয়ের সহিত অন্য কাহারও পরিচয়ের তুলনা হয় না।

দীনেশের পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট্ জজ, তাঁহার সন্তান-সন্ততির মধ্যে কমলা (দিদি) ও পুত্র দীনেশ। আর রশীদের পিতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা এ্যাড্ভোকেট। রশীদ-ই তাঁহার একমাত্র সন্তান। সুতরাং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা বিলাস-ব্যসনের কোন অভাবই এই দুই পরিবারের কাহাকেও কোনদিন অনুভব করিতে হয় নাই। তবে এই পরিপূর্ণ সুখের মধ্যেও দীনেশের পিতার অন্তরের নিভৃত কোণে অনুকূল বায়ু-সংযোগে সময়ে সময়ে অশান্তির আগুণ জ্বলিয়া উঠিত। সে অশান্তির কারণ—কমলা। পিতা একান্ত আধুনিক ধরণে কমলাকে মানুষ করিয়াছিলেন, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাকে যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিধির নির্ব্বন্ধে বৎসর না ফিরিতেই তাহার কপাল ভাঙিয়া যায়। আজ ছয়মাস হইল হিন্দু বিধবার অভিশপ্ত জীবন লইয়া সে পিতার বক্ষঃশেল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

* * * * * * *

কমলা দীনেশের অপেক্ষা মাত্র দুই বৎসরের বড়। কাজেই কনিষ্ঠের নিকট হইতে কোন দিনই সে জ্যেষ্ঠার ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান আদায় করিয়া লইতে পারে নাই। ছেলে বেলা হইতেই সখা-সখী বা খেলার সাথীর মতই তাহারা ক্ষণেক 'আড়ি' ক্ষণেক 'ভাবের' মধ্য দিয়া বাড়িয়া উঠিয়া ছিল। বড় বোন বা ছোট ভাই বলিয়া কাহারও মধ্যে কোন দিন উঁচু নীচু ভাবের উপদ্রব হয় নাই। উপরন্তু অনাবিল সখ্যের ফলে তাহাদের পবিত্র সম্পর্ক বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিয়াছিল।

তবে ইদানীং—বৈধব্যের পর হইতে কমলার একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাহার সে হাসিমাখা মুখ আর ছিল না। সেখানে গাম্ভীর্য্যের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছিল। কৌতুকচঞ্চল চটুল দৃষ্টি ধীর শান্ত ভাস্বর দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে অন্তরের মধ্যে টানিয়া কেন্দ্রীভূত করিয়া সে যেন নিজেকে আত্মসমাহিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। দীনেশ এ সব দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিত না। পূর্ব্বের সেই সহজ সরল মুক্ত প্রাণ লইয়া সে দিদির সঙ্গে আলাপ করিত, অনুযোগ তুলিত,—মান-অভিমানের পালা গাহিতেও ছাড়িত না। কিন্তু তাই বলিয়া সে যে কিছু বুঝিত না, তাহা নহে; তবে সেগুলিকে সে আমল দিত না।

কিন্তু দীনেশ আমল না দিলেও রশীদ দিত। কমলার এ ভাবান্তর সে ভালরূপেই লক্ষ্য করিয়াছিল এবং ইহার সম্যক কারণও নির্ণয় করিয়াছিল। অবশ্য ইহার জন্য রশীদকে লোক-চরিত্রাভিজ্ঞতার দিক দিয়া খুব বড় রকমের একটা সার্টিফিকেট দেওয়া চলে না, কারণ সে দীনেশ অপেক্ষা বয়সে দুই বৎসরের বড়—দীনেশ কুড়ীতে

আর সে বাইশে। কাজেই তাহার অভিজ্ঞতাটা একটু বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

বেলা ১২টা। পড়িবার ঘরে বইগুলি গুছাইয়া রশীদ দীনেশকে ডাকিবার জন্য জানালা খুলিল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে দীনেশকে ডাকা আর তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। জানালা খুলিতেই তাহার চোখে পড়িল—নিজের শুইবার ঘরে মেঝের উপর নতজানু যুক্তকরে বসিয়া কমলা। সম্মুখে তাহার পরলোকগতা জননীর সুবৃহৎ তৈলচিত্র। ধ্যানমূর্ত্তির মত সে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। চক্ষের প্রশান্ত ভাস্বর দৃষ্টি সম্মুখের চিত্রপটের উপর নিবদ্ধ,—নির্নিমেষ অচপল। দুই গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় মুক্তার নির্ঝর নামিতেছে। রশীদ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া অপলকনেত্রে সেই ধ্যানমূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল। সে-ও বুঝি বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পরে সহসা যেন তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। নিজকে সংযত করিয়া নিঃশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া সে বই হাতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সংযম মানুষকে দেবতা করিয়া তোলে বটে, কিন্তু তাহা একান্তই সাধনা-সাপেক্ষ। সাধনা না থাকিলে সংযমে অটল থাকা একেবারেই অসম্ভব। এই জন্যই দেখা যায়, যিনি যতই কেন গুণী মনীষী হউন না, একমাত্র সাধক ব্যতীত প্রলোভনের সম্মুখে কেহই নিজেকে পদস্খলন হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে না। দেহের ক্ষুধা মানুষকে উন্মাদ করিয়া তোলে। সকল শিক্ষা, জ্ঞান ও ধৈর্য্যের উপরে সে তাহার সর্ব্বগ্রাসী প্রভাবকে বিস্তার করিয়া বসে। তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার একমাত্র উপায়—সাধনা-লব্ধ কঠোর সংযম।

সে সাধনা-লব্ধ সংযম কমলার ছিল না। বিবেকের শাসনে যতটুকু সংযম রক্ষা করা সম্ভব, মাত্র ততটুকুই ছিল কমলার সম্বল। তাই বিধবা হইয়া ব্রহ্মচারিণীর সকল আচার নিষ্ঠাকে মানিয়া চলিলেও দেহের অদম্য ক্ষুধাকে সে সহস্র চেষ্টায়ও চাপিয়া মারিতে পারে নাই। তাহার দেহ ও মনের মধ্যে রাত্রিদিন অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চলিত। বিবেকের কশাঘাতে সে তাহার সর্ব্বনাশী ক্ষুধাকে জর্জ্জরিত ও নিস্তেজ করিবার প্রয়াস পাইত। কিন্তু তাহা কি সম্ভব ?

অবশ্য এই অন্তর্বিদ্রোহের কথা কমলা সাধ্যমত কাহাকেও জানিতে দিত না। বাহিরে সে ছিল স্নেহ-মমতার প্রতিমূর্ত্তি, মিষ্ট প্রিয় সম্ভাষণ ব্যতীত তাহার মুখ দিয়া অন্য কোন কথাই বাহির হইত না। সময়ে সময়ে রশীদ ও দীনেশকে সে তিরস্কার করিত বটে, কিন্তু সে স্নেহের তিরস্কার। মাতৃস্বরূপিনী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অনাবিল স্নেহ ও মমতাই সে তিরস্কারের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিত।

* * * * * * *

সন্ধ্যার পর দীনেশ বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল। নিজের ঘরে না গিয়া সে একেবারে সোজা কমলার ঘরে গিয়া ডাকিল, দিদি!

কমলা তখন জানালার ধারে বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। দীনেশের গলার স্বর শুনিতেই তাহার যেন চমক ভাঙিল। উত্তর দিল, কি।

—তুমি Volunteer list এ নাম দিয়েছ?

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল। সে আলোকে কমলা দীনেশের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল তাহার চোখ ও মুখ দিয়া আনন্দ ও উৎসাহ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। কমলা জিজ্ঞাসা করিল, তুই কি কোরে জান্‌লি?

—কাগজে পড়লুম যে! কাল সবশুদ্ধ ২০ জন মেয়ে মহিলা আইন-অমান্য কমিটীতে স্বেচ্ছাসেবকের তালিকায় নাম দিয়েছে। তার ভিতর তোমার নামও রোয়েছে!

—আমার নামের আর কোন মেয়ের বুঝি আর কোল্‌কাতায় থাক্‌তে নেই?

—বা—রে! আমাদের বাড়ীর ঠিকানা রোয়েছে যে!

—সব তো জানাই হোয়ে গেছে দেখ্‌ছি, তবে আর জিজ্ঞাসা কোর্‌ছিস কেন?

বেশ একটু গম্ভীর হইয়া দীনেশ বলিল, আমাকে না জানিয়ে নামটা দিয়ে ভাল করোনি দিদি। আর দিলেই যদি, তবে সঙ্গে সঙ্গে আমার নামটীও দিলে না কেন?

—সে কিরে! তুই কি মেয়েদের দলে ভিড়বি নাকি?

কথাটা শেষ করিয়া কমলা একটা গম্ভীর হাসি হাসিল।

সিঁড়িতে রশীদের গলার স্বর শোনা গেল—দীনেশ, আছ নাকি ?

দীনেশ উত্তর দিল, হাঁ, এসো।

রশীদ ঘরে ঢুকিতেই দীনেশ বলিয়া উঠিল, দেখো ত ভাই, কি অন্যায় !

—কি অন্যায় ?

—আমাদের না জানিয়ে উনি স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লিখিয়েছেন।

রশীদের মুখখানা সহসা অস্বাভাবিকরূপে গম্ভীর হইয়া উঠিল। হঠাৎ সে কোন উত্তর দিতে পারিল না।

দীনেশ আবার বলিল, কেমন—অন্যায় নয় ?

—হুঁ—তা' অন্যায় বই কি ?

কথাটা যেন দীনেশ রশীদের মুখ হইতে জোর করিয়া আদায় করিয়া লইল। নইলে উত্তর দিবার মত অবস্থা বা ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না।

কমলা রশীদের এই ভাবান্তর সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিল। তাই তাহাকে উড়াইয়া দিবার জন্য বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, স্বীকার করলুম, অন্যায়ই হোয়েছে।

শুধু স্বীকার কোর্‌লে হবে না—শাস্তি নিতে হবে।

কমলা একটু হাসিল। জিজ্ঞাসা করিল, কি শাস্তি ?

—আমাদের দু'টোকেও তোমার পিছনে পিছনে টেনে নিয়ে যেতে হবে।

—ও—এই শাস্তি ?

কমলা আবার একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, বেশ, ফরম্ নিয়ে এস, সই কোরে দাও, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—ফরম্ এখন আবার পাই কোথায়?—আচ্ছা, তোমরা একটু বোসো। আমি এখনই নিয়ে আসছি। পাশেই অফিস ত!

দীনেশ ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রশীদ ও কমলা উভয়েই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

এই নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। সহসা রশীদ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সত্যই যাচ্ছ?

গম্ভীর ভাবে কমলা উত্তর করিল, হাঁ।

—কেন?

—ডাক এসেছে। তা' ছাড়া আমার নিজেরও প্রয়োজন হোয়েছে।

একটুখানি থামিয়া কমলা আবার বলিল, আচ্ছা রশীদ, তুমি আর আমায় দিদি বলো না কেন?

রশীদ মাথা নীচু করিল, কোন উত্তর দিল না। কমলা আবার বলিল, এতে আমার কিছু যাবে আস্‌বে না, কিন্তু তুমি নিজকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে ফেল্‌বে, আর বোধ হয় ফেলেছও। যদি আমার ধারণা সত্য হয়, তাহোলে যা'তে ভবিষ্যতে আরও দূরে সোরে না যাও এবং যতটুকু গিয়েছ, ততটুকু আবার ফিরে আস্‌তে পার, তার জন্য চেষ্টা করো।

কমলার কথা শেষ হইতে না হইতেই দীনেশ দুইখানি ফরম্ লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল, এই নাও এনেছি।

কমলার মুখে সেই গম্ভীর হাসি। বলিল, fill up করো।

দীনেশ তাড়াতাড়ি ফরম্ fill up করিয়া নাম সই করিয়া কমলার হাতে দিল। তাহার পর রশীদকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুমি চুপটী কোরে রইলে যে, নাও লেখ!

কমলা ধীরভাবে বলিল, ওরটা এখন থাক্, তোমারটাই আগে যাক্।

—কেন ?

—সকলকেই যে একদিনে এক সঙ্গে দিতে হবে, এমন কি কথা আছে ? ওরটা না হয় কাল যাবে।

—না তা হবে না। এক সঙ্গেই যাক। আমি যার জন্য দুখানা ফরম নিয়ে এলুম।

—একখানা pending রইল—কাল হবে। এখন তুই যা কাপড় চোপড় ছাড়্‌গে। আমারও একটু হেঁসেলে যেতে হবে।

কমলা উঠিয়া ধীর পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দীনেশ ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া যেন হতভম্ব হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রশীদকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে ভাই !

—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রশীদ উত্তর দিল, কিছু না।

৪

সমগ্র দেশে মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন অমান্যের সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে। দলে দলে নরনারী স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হইয়া কেন্দ্রে কেন্দ্রে লবণ আইন অমান্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

—কেন্দ্রে উপর্য্যুপরি দুইজন নেতা গ্রেপ্তার হওয়ায় কমলার উপর সেখানকার সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার অর্পিত হইয়াছে। আজ পাঁচদিন ধরিয়া কমলা অসীম সাহস, ধৈর্য্য ও দক্ষতার সহিত তাহার গুরু কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিয়াছে। ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, বিশ্রাম নাই। দলের পর দল স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইতেছে, আবার নূতন দল আসিয়া তাহাদের স্থান পূরণ করিতেছে। কমলা মায়ের স্নেহে, ভগ্নীর মমতায় পুরাতন দলকে বিদায় দিয়া নূতন দলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে। সত্যাগ্রহ কেন্দ্র যেন তাহার নিজের ঘর বাড়ী। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সে যেন সেখানকার স্নেহময়ী জননী, মমতাময়ী ভগিনী।

দ্বিপ্রহরের পর কমলা আহারান্তে শিবিরে একটু বিশ্রাম করিতেছে। এমন সময়ে বহু কণ্ঠের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি চারিদিকে একটা সাড়া জাগাইয়া দিল। কমলার বিশ্রাম লওয়া হইল না। উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল, প্রায় ২৫ জন নূতন স্বেচ্ছাসেবক শিবির দ্বারে উপস্থিত। গম্ভীর স্নেহ-হাস্যে একে একে সকলকেই সে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। সর্ব্বশেষে যাহাকে অভ্যর্থনা করিল, সে রশীদ। স্বাভাবিক গম্ভীর হাসি হাসিয়া কমলা বলিল, এসেছ? কিন্তু পারবে ত? এ যে বড় কঠোর কর্ত্তব্য।

ম্লান হাস্যে রশীদ উত্তর করিল, এই কঠোর কর্ত্তব্যের আমারও প্রয়োজন হোয়েছে।

কমলা এ ইঙ্গিত বুঝিল কি না জানি না, তবে সে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রামের আদেশ দিয়া ধীর পদে শিবিরে প্রবেশ করিল।

বৈকালে যথারীতি লবণ তৈয়ারী আরম্ভ হইল। কিন্তু আজ আর পুলিশ বড় বেশী সময় দিল না। জল ফুটাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ধর পাকড় সুরু করিয়া দিল। ধ্বস্তাধ্বস্তি ও গ্রেপ্তারের ধূম পড়িয়া গেল। কমলা বসিয়া বসিয়া একটা হাঁড়িতে লবণ-জল জ্বাল দিতেছিল। সেখানে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পুলিশ আসিয়া যখন স্বেচ্ছাসেবকগণকে হটাইয়া দিবার জন্য টানাটানি ও ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিল, সেই সময়ে হুড়াহুড়ির মধ্যে কমলা ধাক্কা খাইয়া সেই তপ্ত লবণ-জল-পূর্ণ হাঁড়ির উপর গিয়া পড়িল। ফলে হাঁড়ি ভাঙিয়া তাহার ভিতরের আগুন-জলে কমলার চোখ মুখ ও বুক সাংঘাতিক রূপে দগ্ধ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের ভিতরে এই কাণ্ড ঘটায় কেহই রক্ষার কোন উপায় করিতে পারিল না। সকলে ধরাধরি করিয়া কমলাকে শিবির মধ্যে লইয়া গেল।

৫

পাঁচদিন পরের কথা। মেডিক্যাল কলেজের Female ward-এ একখানি খাটের উপর কমলা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছে। পার্শ্বে তাহার পিতা ও কনিষ্ঠ দীনেশ সজল নেত্রে বসিয়া। কমলার জীবনের আশা নাই। ডাক্তার শেষ কথা বলিয়া দিয়াছে। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই একে একে দেখিয়া শুনিয়া বিদায় লইয়া গিয়াছে। মাত্র রক্তের মমতায়-বাঁধা পিতা ও সহোদর এখন পর্য্যন্ত তাহাকে আগুলিয়া বসিয়া আছে।

অনেকক্ষণ পরে কমলা চক্ষু মেলিল। স্বপ্নোত্থিতের মত বলিয়া উঠিল, রশীদ!

ক্রন্দন-কম্পিত কণ্ঠে দীনেশ বলিল, ভোরে খবর গিয়েছে। এখনই এসে পোড়্‌বে।

রোগিনী যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। ঠিক সেই সময়ে রশীদ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিল, দিদি!

রোগিনী আবার চক্ষু মেলিল। রশীদের পানে চাহিল। সহসা তাহার সারা মুখখানিতে একটা প্রসন্ন হাসির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সে পিতা ও দীনেশকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিল।

তাঁহারা চলিয়া গেলে কমলা ডাকিল, রশীদ!

—দিদি!

—ভুলের প্রায়শ্চিত্ত?

—যথাসাধ্য কোরেছি। নইলে এমন নিঃসঙ্কোচে ছোট ভাইটীর মত দিদি বোলে তোমার ডাকে আজ সাড়া দিতে পারতুম না।

কমলার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, একটা কথা তোমাকে না বোলে গেলে আজ মরণেও আমার শান্তি হবে না। এতদিন গোপন কোরে এসেছি, আজ প্রকাশের সময় হোয়েছে। শোন ভাই! ভুল তুমিই একা করোনি, আমিও কোরেছিলুম। আজিকার এ-মৃত্যু আমার সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত।

মুহূর্ত্তের মধ্যে রশীদের অন্তরের স্মৃতির সমুদ্র মথিত করিয়া জাগিয়া উঠিল কমলার সে দিনের সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ধ্যানমূর্ত্তি। নির্জ্জন কক্ষে জননীর তৈল-চিত্রের সম্মুখে নতজানু যুক্তকরা ব্রহ্মচর্য্যের সেই ভাব-গম্ভীর প্রতিচ্ছবি। এতদিনে রহস্যটা তাহার সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার দুই চক্ষে অশ্রুর সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে সে ডাকিল, দিদি!

—ভাই!

—আমাকে মার্জ্জনা করো।

—মার্জ্জনা অনেক আগেই কোরেছি ভাই, এখন আশীর্ব্বাদ করি, আমার এই মরণ-প্রায়শ্চিত্ত তোমার জীবনকে শুদ্ধ-সুন্দর আনন্দময় করুক।

রোগিনী বিদগ্ধ শীর্ণ হাতখানি রশীদের মাথার উপর রাখিতে গেল, কিন্তু পারিল না। অবশ শিথিল হইয়া তাহা উপাধানেই ঢলিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বশরীর একবার অস্বাভাবিকরূপে কাঁপিয়া উঠিল।

রশীদ ক্রন্দনাবেগে প্রায়াবরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, দিদি, দিদি!

দীনেশও পিতার সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, দিদি!

স্থবির পিতার আকুল কণ্ঠ ফাটিয়া ধ্বনিত হইল, মা!

কোথায় দিদি, কোথায় মা, কে উত্তর দিবে! মর্ম্মাহত শোকার্ত্ত-কণ্ঠের ব্যাকুল বিলাপ নিস্তব্ধ কক্ষের বায়ুস্তরে মিলাইয়া গেল।

চরিত্রহীন

১

কলেজে পড়িবার সময়েই চরিত্রহীন বলিয়া লতিফের একটা দুর্নাম রটিয়া গিয়াছিল। তাই বি-এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া যখন সে ঘরে আসিয়া বসিল, তখন অভিভাবক হইতে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। পড়াশুনায় চিরকালই লতিফ ভাল ছেলে। প্রবেশিকা ও আই-এ পরীক্ষায় সে বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। বি-এটাও যে হাসিতে হাসিতে পাশ করিবে, এ ধারণাটাও সকলের মনে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু হঠাৎ সে ধারণা উল্টাইয়া দিয়া লতিফ ফেল করিয়া ঘরে আসিয়া বসিল। সকলেই বিশ্বাস করিল, চরিত্রহীনতাই লতিফের অকৃতকার্য্যতার একমাত্র কারণ এবং এই বিশ্বাসের ফলে সকলেই তাহার উপর অন্তরে অন্তরে চটিয়া গেল।

দুর্নামটা রটিয়াছিল বৎসর খানেক পূর্ব্বে তাহারই স্বগ্রামবাসী সহপাঠী সামাদের মারফতে। সামাদ লতিফের সহিত একই মেসে থাকিয়া একই কলেজে একই ক্লাশে অধ্যয়ন করিত। লতিফের প্রতি একটা নীচ হিংসা সে বরাবরই অন্তরে অন্তরে পোষণ করিয়া আসিয়াছিল। ইহার একমাত্র কারণ—সর্ব্ব লোকমুখে লতিফের প্রশংসা। 'ভাল ছেলে' বলিয়া লোকে শতমুখে লতিফের সুখ্যাতি করিত, ইহা সামাদের সহ্য হইত না।

খুঁটী নাটি দোষ ত্রুটী পাইলেই সে লতিফকে বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয় মহলে 'খাঁটো' করিবার চেষ্টা পাইত। কিন্তু উহাতে বিশেষ কোন ফল হইত না। লতিফের প্রতি কাহারও অন্তরের শ্রদ্ধা বা স্নেহ তাহাতে এতটুকু হ্রাস পাইত না। এই ভাবেই দিন কাটিয়া যাইতেছিল। শেষে এমন একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল, যাহাতে লতিফের প্রতি লোকের অন্তরের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়া গেল। দেশে আত্মীয়-স্বজন ও অভিভাবকগণ প্রথম প্রথম কথাটা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কিন্তু সামাদ যখন তাঁহাদের নিকট প্রমাণের উপর প্রমাণ আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল তখন আর সেটাকে 'বাজে কথা' বলিয়া তাঁহারা উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। কিন্তু না পারিলেও লতিফকে তাঁহারা কলেজ ছাড়াইয়া বাড়ীতে আনিয়া বসাইয়া রাখিলেন না। কারণ তখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের এ বিশ্বাসটুকু ছিল যে, লতিফ যাহাই করুক না কেন, পড়াশুনার বেলায় সে ঠিক আছে এবং প্রবেশিকা ও আই-এর মতই বি-এর গণ্ডীটাও হেলায় পার হইয়া যাইবে এবং এই বিশ্বাসের ফলেই তাহাকে কলেজ না ছাড়াইয়া বিশেষরূপে সাবধান করিয়া তখনকার মত তাঁহারা নিরস্ত হইলেন ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফল ফলিল বিপরীত। তখন সকলেই হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিলেন।

বাড়ীতে পা দিতেই সকলের মুখ ভার-ভার দেখিয়া লতিফ ব্যাপারটা কতক পরিমাণে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার পর দুই এক দিন পরেই যখন জানিতে পারিল যে, তাহার পড়াশুনা এইখানেই শেষ, তখন তাহার মনটা হঠাৎ যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা যে এতদূর আসিয়া গড়াইবে, তাহা সে কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই। মনে মনে পিতার উপর এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধারণাকে অন্তরের মধ্যে বদ্ধমূল

করিবার পক্ষে যে সমস্ত আত্মীয় স্বজন সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের উপর সে মর্ম্মে মর্ম্মে চটিয়া উঠিল, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করিল না।

এই ভাবে প্রায় সপ্তাহ খানেক কাটিয়া গেলে সহসা একদিন কলিকাতা হইতে এক পত্র আসিল। পত্র পাইয়া লতিফ আর কাল বিলম্ব করিল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই দিনই বৈকালে সে কলিকাতা রওয়ানা হইয়া পড়িল।

২

কলিকাতার এক দরিদ্র পল্লীতে একখানি খোলার ঘরে ভাঙা তক্তা পোষে ছেঁড়া মাছুরের উপর মৃত্যুশয্যায় শায়িতা এক প্রৌঢ়া নারী, আর তাহার শিয়রে অশ্রু-সজলচোখে বসিয়া এক চতুর্দ্দশী কিশোরী। ক্ষীণকণ্ঠে রমণী ডাকিল, সাজেদা !

—মা !

—লতিফ এলো না !

—এখনই আসবেন, চিঠি পেতে বোধ হয় দেরী হোয়েছে তাই—

সাজেদার কথা শেষ না হইতেই লতিফ ঘরের মধ্যে আসিয়া দেখা দিল। সাজেদার মলিন মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—কি হোয়েছে সাজেদা ! এমন অবস্থা কেন ? বলিতে বলিতে লতিফ রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার কপালে হাত দিল।

সাজেদা বলিল, আপনি চোলে যাওয়ার পর দিন রাত্রে হঠাৎ কাশ্‌তে কাশ্‌তে মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই কেঁপে জ্বর আসে। তার পর ক্রমে ক্রমে এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

সাজেদার কথা শেষ হইতেই রোগিণী ক্ষীণতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কে সাজেদা !

সাজেদার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই লতিফ বলিয়া উঠিল, আমি লতিফ।

রোগিণীর চোখ দুইটী সহসা যেন অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি কি একটা কথা বলিতে গেলেন কিন্তু পারিলেন না।

লতিফ তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার ডাকবো কি ?

রোগিণী ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন। লতিফ আর বিশেষ জেদাজেদি করিল না। সে অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিয়া লইয়াছিল, এখন আর ডাক্তার ডাকিয়া কোন লাভ নাই—শেষ নিশ্বাস পড়িতে যা বাকী।

অনেকক্ষণ পরে রোগিণী ডাকিলেন, সাজেদা !

তাঁহার স্বর আরও ক্ষীণ। সাজেদা তাঁহার মুখের উপর মুখ লইয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিল, মা !

রোগিণী কথা বলিলেন না, ধীরে ধীরে কন্যার একখানি হাত ধরিয়া লতিফের হাতের উপর রাখিলেন। তাহার পর উপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন।

লতিফ ও সাজেদা উভয়েরই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। জল-ভরা চোখ মুছিয়া যখন তাহারা রোগিণীর মুখের পানে চাহিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সাজেদা আর্ত্তনাদ করিয়া মৃতার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল। আর লতিফ ?—অটল পাষাণ মূর্ত্তির মত বসিয়া স্থির দৃষ্টে জীবন নাট্যের সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

৩

এক বৎসর পূর্ব্বে কলেজ হইতে মেসে ফিরিবার পথে এই বাড়ীর সম্মুখেই সাজেদার সহিত লতিফের প্রথম পরিচয় হয়। তিন মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়িয়াছিল, আদায় করিতে না পারায় বাড়ীওয়ালা তাহাদিগকে বাড়ী হইতে রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়াছিল। সেই সূত্রে বহু কৌতূহলী দর্শক 'মজা' দেখিবার জন্য বাড়ীর সম্মুখে জটলা করিতেছিল। লতিফও ছিল এই জটলাকারীদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন দেখিল 'বেনিয়া' বাড়ীওয়ালা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতে করিতে বোরকাপরিহিতা মা ও মেয়েকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সেইখানেই বাড়ীওয়ালার সঙ্গে একটা রফা করিয়া এই অসহায়া স্ত্রীলোক দুইটীকে লজ্জা ও অপমানের হাত হইতে বাঁচাইয়া দিল এবং সেই দিন হইতে তাহাদের সমস্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইল।

এই ব্যাপারে লতিফকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। বাড়ী হইতে তাহার খরচের জন্য মাসিক বরাদ্দ আসিত ৩৫৲ টাকা, কিন্তু তাহাতে ত নিজের ও এই অনাথাদের খরচ কুলানো সম্ভব নয়; কাজেই নিজের পড়ার ক্ষতি করিয়াও তাহাকে সকালে সন্ধ্যায় মাসে ৩০৲ টাকা আয়ের 'টিউশনি' যোগাড় করিয়া লইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই 'টিউশনি'ই তাহার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার একমাত্র কারণ।

অনুসন্ধিৎসু সামাদের চোখে ব্যাপারটা অতি অল্প দিনের ভিতরেই ধরা পড়িয়াছিল এবং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, অত্যন্ত কুৎসিত ভাবেই সে ঘটনাটাকে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছিল। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

* * * * *

সমস্ত ব্যয়ভার যদিও লতিফ বহন করিত, তথাপি যতদিন মা বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন সাজেদা তাঁহার অনেকখানি ভরসা রাখিত এবং সেটা স্বাভাবিকই। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর সে সম্পূর্ণরূপে লতিফের গলায় আসিয়া পড়িল। আগে চিন্তা ছিল কেবল মাত্র ভরণপোষণের, এখন তাহার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তাও আসিয়া জুটিল। একাকিনী সাজেদাকে সেই আত্মীয়-স্বজন-পরিশূন্য গৃহে রাখিয়া লতিফ কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে মেসে আসিয়া বাস করিবে! অগত্যা তাহাকে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া সেই বাড়ীতেই আর একখানি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতে হইল।

'টিউশনি'টা বজায় ছিল। সকাল সন্ধ্যায় সেখানে পড়াইয়া লতিফ সমস্ত দিন চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া দিল। ফলে অল্প দিনের ভিতরেই একটা বন্দোবস্তও হইয়া গেল। সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিল।

কিন্তু সে নিশ্চিন্ত হইলেও বাড়ীর অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের মনের ভিতর অশান্তির আগুন ধোঁয়াইয়া উঠিতেছিল। তাহারা লতিফ ও সাজেদার এই আত্মীয়তাটাকে বড় ভাল চোখে দেখিল না। ভিতরে ভিতরে নানা রকম কানা ঘুষা আরম্ভ করিয়া দিল এবং সুযোগ পাইলেই কথা প্রসঙ্গে উভয়ের প্রতি কুৎসিত বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

লতিফ যতদূর সম্ভব এসব প্রসঙ্গ এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিত। সে সুযোগও তাহার ছিল যথেষ্ট। কারণ, দিনের বেলাটা প্রায়ই সে বাহিরে থাকিত, আর রাত্রিতেও কাহারও সঙ্গে তাহার বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হইত না। হইলেও কেহ আলাপ জমাইবার সুযোগ ঘটাইতে পারিত না। কিন্তু মুশ্‌কিল হইয়াছিল সাজেদাকে লইয়া। সে ত বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র

যাইতে পাইত না। কাজেই কুৎসা ও পর চর্চ্চাপ্রিয় মেয়েরা আসিয়া সমস্ত দিন কথার ঘায়ে তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত। তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিবার সম্বল তাহার কিছু ছিল না, কাজেই নীরবে মুখ বুঁজিয়া সব কিছুই সহ্য করিতে হইত। কিন্তু ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে, ক্রমে ক্রমে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

রাত্রি প্রায় নয়টা। লতিফ আহারে বসিয়াছে, সাজেদা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। অন্যদিন সাজেদা ভাত তরকারী সমস্ত দস্তরখানের উপর সাজাইয়া রাখিয়া নিজের ঘরে চলিয়া যায়, আজ আর তাহা করে নাই। এই ব্যতিক্রম দেখিয়া লতিফের মনে কেমন যেন সন্দেহ হইল। সে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কি কিছু বোলবে সাজেদা?

সাজেদা আজ পর্য্যন্ত নিজে উপযাচিকা হইয়া লতিফকে কোন কথা বলে নাই, আজ বলিতে আসিয়াছিল। কিন্তু বলি-বলি করিয়া লজ্জা ও সঙ্কোচে তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গিয়াছিল। এখন সুযোগ পাইয়া বলিল, হাঁ।

লতিফ জিজ্ঞাসা করিল, কি?

সাজেদা নতমুখে রহিয়াই বলিল, এ বাড়ীতে ত আর থাকা যায় না।

তাহার স্বর বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী।

লতিফ সব বুঝিল, কিন্তু হঠাৎ কোন উত্তর দিল না। নীরবে আহার শেষ করিয়া যাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, আর একটা দিন কোন রকমে কাটাও, কাল বিকেলেই আমি আফিস ফের্‌তা বাড়ী খুঁজতে বেরুবো।

সাজেদা মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

৪

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রান্নাবান্না শেষ করিয়া সবেমাত্র সাজেদা নিজের ঘরে গিয়া বসিয়াছে, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, বাড়ীতে কেউ আছেন?

সাজেদা জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল ধুতি চাদর পরিহিত কে একজন লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। লোকটীকে কোন দিন সে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লোকটী আবার ডাকিল, বাড়ীতে কে আছেন, আমি লতিফ সাহেবের কাছ থেকে আসছি।

কি একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় সাজেদার বুকের ভিতরটায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। জানালার কাছে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর বলুন।

আগন্তুক বলিতে লাগিল, ইটালিতে বাড়ী পাওয়া গিয়াছে। লতিফ সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন, জিনিসপত্র নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন।

সাজেদা ভাবিল, এ কেমন কথা। এই অপরিচিত লোকের সঙ্গে যাইব কেমন করিয়া? সে জিজ্ঞাসা করিল তিনি কোথায়?

—তিনি সেই বাড়ীতেই আছেন, এখন আসতে পারবেন না। নিজে দেখে শুনে সব সাফ সুত্‌রা করাচ্ছেন।

সাজেদা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কি করিবে। একবার ভাবিল তাহাকে আসিতে বলিয়া দিই, কিন্তু পরক্ষণেই আশঙ্কা জাগিল, যদি রাগ করেন। দুই একবার 'তোনা মোনা' করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সে যাওয়াই স্থির করিল এবং আগন্তুককে গাড়ী ডাকিতে বলিয়া জিনিসপত্র

গুছাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। অতঃপর গাড়ী আসিলে মালপত্র লইয়া গাঁড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল।

রাত্রি প্রায় ১০টার সময় কলিকাতার অলিতে গলিতে বাড়ী খুঁজিয়া হয়রান হইয়া লতিফ বাসায় ফিরিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মুখ হইতে কথা সরিল না। প্রথমটা সে হতবুদ্ধির মত 'কাট' হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিয়া অন্য ভাড়াটিয়াদের মুখে যখন সকল কথা শুনিল, তখন সেইখানেই মেঝের উপর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

৫

লতিফের হঠাৎ বাড়ী হইতে চলিয়া আসার ফলে সেখানকার সকলেই ধারণা করিয়া লইল, এই 'হতভাগা ছোকরার' উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নাই, সে একেবারেই গোল্লায় গিয়াছে। কিন্তু অন্য লোকে যাহাই বলুক না কেন, লতিফের বাপের মন পুত্রের উদ্ধারের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারে নাই। তিনি তলে তলে 'মেয়েটাকে' (সাজেদাকে) সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার এ চেষ্টায় সহায় হইল সামাদ।

লতিফের চলিয়া আসার কয়েকদিন পরে সামাদও কলিকাতা আসিল। সাজেদারা যে বাড়ীতে বাস করিত, সামাদ তাহা জানিত। সুতরাং খোঁজা খুঁজির আর প্রয়োজন হইল না। দু একদিনের মধ্যেই সে সেই বাড়ীর একটা বদমাইস লোককে হাত করিয়া ফেলিল। বহুদিন হইতে সাজেদার উপর এই লোকটীর কু-দৃষ্টি পড়িয়াছিল, কিন্তু সুযোগের অভাবে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং সামাদের কথায় সে অতি সহজেই রাজী হইল। কথাবার্ত্তা ঠিক হইল যে, সে সামাদকে সকল সংবাদ যোগাইবে, আর সামাদ কৌশলে সাজেদাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিবে। এই বন্দোবস্ত অনুসারে লোকটী সমস্ত খবরই সামাদকে যোগাইত। লতিফের আফিস ফেরতা বাড়ী খুঁজিতে যাওয়ার সংবাদ সে-ই তাহাকে দিয়াছিল। সাজেদা দিনের বেলায় বাড়ীর অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল, কাজেই গোপনীয় হইলেও কথাটা এই গুপ্তচরের কানে গিয়া উঠিয়াছিল। খবর পাইয়াই সামাদ সুযোগ ধরিয়াছিল এবং

সন্ধ্যার পর মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া সংসার জ্ঞানহীনা সরলা সাজেদাকে বাড়ীর বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

*   *   *   *

লতিফ কতক্ষণ যে হতভম্ব হইয়া বসিয়াছিল, তাহা সে জানে না, হঠাৎ কে একজন পিছন দিক হইতে স্নেহকণ্ঠে কহিল, আর ভেবে কি হবে বাবা, যা হবার হ'য়ে গিয়েছে, কেন আর ভেবে ভেবে নিজের দেহটা মাটী করবে?

লতিফ পিছন ফিরিয়া দেখিল, সেই বাড়ীরই একজন বৃদ্ধ ভাড়াটীয়া। সে লোকটাকে চিনিত, এ-বাড়ীর মধ্যে একমাত্র এই লোকটারই কাছে সময়ে অসময়ে সে দুই একটী মিষ্ট কথা শুনিতে পাইত। তাই ব্যথায় ব্যথী দেখিয়া লতিফ তাহার পানে করুণ ছল ছল নেত্রে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ আবার বলিল, ওঠ, আর এখানে বসে থাকে না, আজ আমার ওখানেই থাক্‌বে চল।

লতিফ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কি লোকটাকে দেখেছিলেন?

—দেখেছিলুম, কিন্তু বুড়ো মানুষ অতটা ঠাওর করতে পারি নি।

কথাটা শেষ করিয়াই বৃদ্ধ সহসা উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল, হাঁ হয়েছে পুঁটু তাকে চেনে, সে-ও গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে দেখ্‌লুম। বলা বাহুল্য, পুঁটু সামাদের গুপ্তচর ব্যতীত আর কেহ নয়।

ঘরে যদি আলো থাকিত, তাহা হইলে বৃদ্ধ দেখিতে পাইত, লতিফের চোখ মুখ অস্বাভাবিকরূপে লাল হইয়া উঠিয়াছে, অতিমাত্র উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে।

মুহূর্ত্ত পরেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আপনি যান, আমি একবার বাহিরে যাব।

—এত রাত্রে কোথায় যাবে বাবা, কাল সকালে যা হয় কোরো। আজকের মত—

বৃদ্ধকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই লতিফ বলিয়া উঠিল, না, এখনই যেতে হবে। আপনি ভাববেন না, আমি একটু পরেই ফিরে আসব।

লতিফ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পুঁটুকে লতিফ ভাল করিয়াই চেনে। শুধু সেই বা কেন? পাড়ার সকলেরই কাছে গুণ্ডামী ও বদমায়েশীর জন্য সে বিশেষভাবে পরিচিত। সাজেদার প্রতি তাহার যে একটা লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এ সন্দেহ লতিফের মনে পূর্ব্বেই জাগিয়াছিল। কিন্তু বিশেষ কোন প্রমাণ না পাইলে ত কিছু করা যায় না, কাজেই সে উচ্চবাচ্য করে নাই। আজ সে সন্দেহ তাহার মনের ভিতর বদ্ধমূল হইয়া গেল। সে স্থির বিশ্বাস করিল, ইহা পুঁটুরই কাজ। সাজেদার সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই সে এই কৌশল করিয়াছে। সুতরাং শয়তানকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে।

বাহিরে আসিয়া রাস্তার মোড় ফিরিতেই লতিফ দেখিল পুঁটু হন্ হন্ করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিতেছে। নিকটে আসিতেই লতিফ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দাঁড়াও।

পুঁটু চমকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। লতিফের মূর্ত্তি দেখিয়া সে যেন একটু দমিয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে!

বজ্রকণ্ঠে লতিফ জিজ্ঞাসা করিল, তাকে কোথায় রেখে এসেছিস্?

কিছুই জানে না ; মুখে এমনি বিস্ময়ের ভাব ফুটাইয়া পুঁটু জিজ্ঞাসা করিল, কাকে ?

পূর্ব্ববৎ স্বরে উত্তর হইল, সাজেদাকে।

পাগল নাকি ! বলিয়া পুঁটু সাজোরে লতিফের নিকট হইতে হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। উপরন্তু চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্ঞানটা তাহার ভাল রূপেই জন্মাইয়া গেল যে, লতিফের বজ্রমুষ্টি হইতে নিজেকে মুক্ত করা তাহার পক্ষে মোটেই সহজ সাধ্য নয়।

লতিফ পুনরায় ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখনও বল, নইলে তোকে খুন করব।

পুঁটু আর জোর করিল না। তৎপরিবর্ত্তে কৃত্রিম বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বলছেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না ; আপনারই লোক এসে ত তাকে নিয়ে গেল—

আমার লোক, না তোর চর ?

পূর্ব্ববৎ ভাবে পুঁটু বলিল, আপনি আশ্চর্য্য করলেন দেখছি !

তাহার পর সহসা ক্রোধের ভাব দেখাইয়া বলিল, দেখুন, এরকম ভাবে আপনি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপমান করবেন না, ভাল হবে না বলছি।

লতিফ একটা ক্রূর হাসি হাসিল, তাহার পর বলিল, করলে কি করবি ?

তাহার ভাব দেখিয়া পুঁটু আর কিছু বলিল না। বলিবার প্রয়োজনও হইল না। লতিফ কি ভাবিয়া সহসা তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, যা—

পুঁটু একবার তাহার মুখের পানে চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে

বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। লতিফও মিনিট পাঁচেকের জন্য এদিক ওদিক ঘুরিয়া অবশেষে নিজের অন্ধকার ঘরটীতে গিয়া "গুম" হইয়া বসিয়া রহিল।

নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্যই পুঁটু অত তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিয়াছিল। কিন্তু যখন বুঝিল, সব জানাজানি হইয়া গিয়াছে, আর ঢাকা দেওয়া চলিবে না, তখন সে রাত্রির মধ্যেই সাজেদাকে সরাইয়া ফেলিবার মতলব করিল, কি জানি, বিলম্ব হইলে যদি খুঁজিয়া বাহির করে। সে বাসায় আসিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল তাহার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া লতিফের ঘরের মধ্যে উঁকি মারিল। অন্ধকার ঘর কিছুই দেখা গেল না। সে সন্তর্পণে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

লতিফ অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়া এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিল; এবং এই জন্যই সে তখন পুঁটুকে ধরিয়াও ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন সময় বুঝিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সে অলক্ষ্যে পুঁটুর অনুসরণ করিল।

বেলেঘাটা অঞ্চলে এক দুর্গম গলির মধ্যে একখানি খোলার ঘরের দরজার সম্মুখে গিয়া পুঁটু দাঁড়াইয়া পড়িল। চকিতের মধ্যে একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া দরজায় ধাক্কা দিল। লতিফ তখন অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দরজা ভিতর হইতে খুলিয়া গেল। পুঁটু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সাজেদা খুবই বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু নিরুপায় সে, কি করিবে! ঘরে ঢুকিয়াই পুঁটু বলিল, এখানে থাকা হবে না। অন্য জায়গায় ঘর ঠিক করেছি এখনই যেতে হবে।

—আমি যাব না।

—না গেলে এখানে পচে মরতে হবে।

—তা—ই মরব।

—ধমক দিয়া পুঁটু বলিল ও সব ন্যাকামি রাখ। যা বলছি, তাই কর।

—আমি পারব না।

—এখনও ভালয় ভালয় বলছি চল, নইলে এর পর চুলের মুটী ধরে নিয়ে যাব।

মরিয়া হইয়া সাজেদা সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, তুমি যদি অমন করে আমায় বিরক্ত কর, তা হলে আমি চেঁচিয়ে পাড়ার লোক জমা করব।

তবেরে হারামজাদী, বলিয়া নিতান্ত অতর্কিত ভাবে পুঁটু ছুটিয়া গিয়া সাজেদার গলা টিপিয়া ধরিল। লতিফ ততক্ষণ দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হঠাৎ এই আক্রমণ দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাঘের মত পুঁটুর উপর লাফাইয়া পড়িল। অতর্কিত আক্রমণে পুঁটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। সে দেখিল সাক্ষাৎ যমের মত আসিয়া লতিফ তাহার উপর পড়িয়াছে। সে সাজেদাকে ছাড়িয়া দিল। লতিফ রুদ্র গর্জ্জনে হাঁকিয়া কহিল, বেরো শয়তান, এখনই বেরিয়ে যা এখান থেকে।

পুঁটু পিছু হটিয়া দরজার সম্মুখে আসিল, এবং পর মুহূর্ত্তেই কোমর হইতে এক তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিয়া লতিফের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিল। সাজেদা তাহাকে দেখিতে পাইয়া হাঁ' হাঁ' করিয়া যেমন বাধা দিতে অগ্রসর হইল, অমনি সেই ছোরা আমূল তাহার বুকের মধ্যে গিয়া বসিল। সে সেই খানেই মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

সাত দিন পরের কথা। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটী ঘরে

মুমূর্ষ সাজেদার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া লতিফ। তাহার চক্ষু দুইটী জবা ফুলের মত লাল। মুখ শুষ্ক, চুল রুক্ষ এলোমেলো, দেখিলেই উন্মাদ বলিয়া মনে হয়। অনেকক্ষণ পরে সে ডাকিল, সাজেদা।

সাজেদা একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল, অনেকক্ষণ পরে অতি কষ্টে বলিল, আমি—যাই, আমাকে মার পাশে উঃ।

সে আবার নীরব হইল। লতিফের চক্ষে অশ্রু নাই, আছে আগুন, সেই আগুনে সে যেন কাহাকে দগ্ধ করিতে চায়। কিছুক্ষণ পরে সে আবার ডাকিল, সাজেদা।

সাজেদা উত্তর দিল না। তাহার চোখ দুইটী অল্প একটু বিস্ফারিত হইল, ঠোঁট দুইটী ঈষৎ নড়িয়া উঠিল। তাহার পর সব শেষ। অসহ্য অন্তর্দ্দাহে আগ্নেয়-গিরি ফাটিয়া গেল। লতিফের রক্ত চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুর অনল ধারা ছুটিল।

বিপর্য্যয়

১

ষোল পার হইয়া লতিফা যে দিন সতেরোয় পা দিল, ঠিক সেই দিনই তাহার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইল। সে প্রশংসার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—আসিবার মত যাহারা, তাহাদের প্রায় সকলেই এই শুভ সংবাদ শুনিয়া তাহাকে Congratulate করিতে আসিল। আসিল না কেবল একজন—সঈদ। কিন্তু তাহাকেই লতিফা সকলের আগে আশা করিয়াছিল।

সলাজ মধুর হাস্যে সারা বিকালটা লতিফা শুভার্থীগণের অভিনন্দন গ্রহণ করিল। কেহ জানিতেও পারিল না যে, তাহার সেই হাসির অন্তরালে ম্লানিমার ক্ষীণ ছায়া লুকাইয়া আছে,—অনাগত একান্ত আপনার জনের অভাবে একটা দুঃসহ ব্যথা তাহার মনের কোণে গুমরিয়া ফিরিতেছে।

সকলকে বিদায় দিয়া লতিফা ছাদের উপর গিয়া একখানি বেতের চেয়ার লইয়া বসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। লতিফা উদাস দৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিতেই সহসা পরিচিত কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া উঠিল। সে উৎকর্ণ হইল। পর মুহূর্ত্তেই সিঁড়িতে জুতার শব্দ

শুনিয়া আকুল প্রতীক্ষায় সেই দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতর আশা-নিরাশার, উৎকণ্ঠা-আকুলতার তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া সঈদ লতিফার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সারা মুখখানিতে হাসির দীপ্তি ফুটাইয়া বলিল, বখ্‌সিস দেবার ভয়ে ছাদে এসে লুকিয়েছ বুঝি!

লতিফা গম্ভীর ভাবে বলিল—হুঁ।

সঈদ লতিফার এ গাম্ভীর্য্যকে আদৌ আমল দিল না। পূর্ব্বের মতই হাসিয়া কহিল, কিন্তু ধরা যখন পোড়েছ তখন তা আর না দিয়ে পারছ না।

আমি কারো ভয়ে লুকুতেও আসিনি, ধরাও পড়িনি।

লতিফার স্বর আগের মতই গম্ভীর।

Self-Contradiction! Self-Contradiction!!

সঈদ একটা উচ্চ হাসির রোল তুলিল। পরে আবার বলিল, এই একটু আগেই আমার কাছে স্বীকার কোরেছ—বখ্‌সিস্ দেবার ভয়ে ছাদে পালিয়ে এসেছ।

লতিফার গাম্ভীর্য্যের বাঁধ যেন একটু ধ্বসিয়া পড়িল। এই প্রাণখোলা সাদা মানুষটীর উপর রাগ বা অভিমান করিয়া সে কোন দিনই জয়ী হইতে পারে নাই, আজও বুঝি পারিল না। বলিল, বেশ কোরেছি,—স্বীকার কোরেছি। আমার খুসী।

তেম্‌নি আনন্দ-হাস্যে সঈদ বলিল, শুধু তোমার খুসী হোলে তো হবে না, আমাকেও যে খুসী কোরতে হবে।

সমস্ত দিন কাটিয়ে—এখন রাত্রির বেলায় এসে হাজির হোলেন—

ওঁকে খুসী কর্‌তে হবে। না এলেই তো চোল্‌তো, কে আস্‌তে "মাথার কিরে" দিয়েছিল ?

কথাটা শেষ করিয়া কৃত্রিম রাগে লতিফা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

—ও—দেরীর জন্য বুঝি বখ্‌সিস্‌ Forfiet হোয়ে গেছে ? বেশ Late fine দিচ্ছি, তা হোলে ত হবে ?

—আর Late fine দিতে হবে না। বাপ্‌রে বাপ্‌! এমন কুঁড়ে মানুষও থাকে! এইটুকু আস্‌বেন, তা দিনটা শেষ না কোরে আস্‌তে পার্‌লেন না। একলাটী আমাকে কি মুশ্‌কিলে পোড়্‌তে হয়েছিল জানো ?

—না জান্‌লেও একটু একটু বুঝ্‌তে পার্‌ছি বই কি! তা' যখন সকলের শেষে—"সভাশেষে নিশান্তের শশাঙ্ক সমান" এসে পোড়েছি, তখন "মহারাণী"—

বাধা দিয়া লতিফা বলিল, আর কবিতা কোরতে হবে না, কোথায় থাকা হয়েছিল এতক্ষণ ?

—মিটিংএ।

—মিটিংএ!

—হ্যাঁ মিটিংএ, শিউরে উঠ্‌লে যে ?

—না আর মিটিং ফিটিংএ যেয়ো না!

লতিফার কণ্ঠস্বরে অনুজ্ঞার আভাস সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল।

একটু হাসিয়া সঈদ জিজ্ঞাসা করিল, কেন ?

—'কেন' আবার ? 'কেন' কথার কোন জবাব আছে নাকি ?

—জবাব নিশ্চয়ই আছে। তবে তুমি যদি না বল, সে অন্য কথা। কিন্তু না বোল্‌লেও আমি বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছি।

—কি বুঝেছ ?

—ধোরে নিয়ে যাবে।

—ছাই বুঝেছ। ধোরে নিয়ে যাবে তাতে আমার কি ?

—একেবারে যে 'কিছু' নয় তা-ই বা কেমন কোরে বলি।

—'কিছু' ত 'কিছু'—বেশ! আমি আর তোমার সঙ্গে বোক্‌তে পারি না। এত কথাও মানুষ শিখে রাখে—বাবা রে বাবা!

হঠাৎ নীচে হইতে ডাক পড়িল, লতি!

লতিফা ত্রস্তে উঠিয়া বলিল, মা ডাক্‌ছেন, চলো নীচে যাই।

কথাবার্ত্তা অর্দ্ধপথেই থামিয়া গেল! সঈদ উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে ধীরে ধীরে উভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

২

সঈদ লতিফার দূর সম্পর্কীয় ভাই। তবে ছেলেবেলা হইতে উভয়ে একসঙ্গে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে যে ব্যবধানটুকু থাকা উচিত ছিল, তাহা মোটেই ছিল না। সঈদের পিতা কোন সওদাগরী অফিসে কাজ করিতেন। কিন্তু যে বেতন তিনি পাইতেন, কলিকাতা শহরে পৃথক বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে বাস করার পক্ষে তাহা যথেষ্ট ছিল না। কাজেই লতিফার পিতার অংশীদার স্বরূপে তাঁহার সহিত একই বাড়ীতে বাস করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সূত্রে সঈদ ও লতিফার ঘনিষ্টতার সূত্রপাত হয়।

প্রথম সাক্ষাতে সঈদ লতিফাকে খেলার সাথী রূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সে বেশী দিনের জন্য নয়। একটু বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সম্পর্ক উল্‌টাইয়া তাহারা গুরু-শিষ্যার পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়ায়। আর আজ?—আজ তাহাদের সে সম্পর্ক অটুট আছে বটে, কিন্তু তাহারই অন্তরালে উভয়ের মনের গোপন কোণে আর এক নবতন সম্পর্কের মঙ্গল আভাস তাহাদের চিত্তকে আনন্দ-সজাগ করিয়া তুলিয়াছে।

মাস কয়েক হইল সঈদ এম-এ পাশ করিয়াছে, এবং সুবিধামত কোন চাকুরী যোগাড় করিতে না পারায় উপস্থিতের জন্য এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে টিউশনী শুরু করিয়াছে। একটু অর্থ-স্বাচ্ছল্য হওয়ায় সঈদের পিতা আজ মাস দুই হইল নিকটেই একটা পৃথক বাড়ী লইয়া সপরিবারে সেখানে উঠিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উঠিয়া গেলেও সঈদ ও লতিফার মধ্যে ছাড়াছাড়ি মোটেই হয় নাই। সঈদ ভাত খাইত বাড়ীতে আর কুলী ফেলিত লতিফার কাছে—এই ছিল তাহার অবস্থা।

ইদানীং—মাসখানেক হইতে সঙ্গীদ একটু বেশীমাত্রায় 'স্বদেশী' হইয়া পড়িয়াছে। খদ্দর-পরা হইতে আরম্ভ করিয়া মিটিংএ মিটিংএ গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া পর্য্যন্ত অনেক কাজই সে করিতে আরম্ভ করিয়াছে। লতিফা কিন্তু এটা বড় একটা পছন্দ করিত না। কি জানি যদি বিপদ ঘটিয়া বসে! লতিফার কোমল প্রাণ আজও পর্য্যন্ত ততখানি আঘাত সহ্য করিবার মত দৃঢ়তা বা শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে নাই। লতিফার বাপ-মা-ও যে এটা খুব পছন্দ করিতেন, তাহা নহে। কারণ, তাঁহারাও সঙ্গীদকে জামাই করিবার ষোল আনা আশা অন্তরে-অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন।

* * * * *

এক মাস পরের কথা। বেলা প্রায় বারোটার সময় লতিফার মা লতিফার ঘরের রুদ্ধ দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া রূঢ়স্বরে কহিলেন, বলি তোর কাণ্ডকারখানাটা কি বল্‌তো লতি! খেতে দেতে হবে, না রাতদিন 'গুম' হোয়ে বিছানায় পোড়ে থাক্‌লে পেট ভোর্‌বে?

লতিফা বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল। সেই অবস্থাতেই উত্তর দিল, আমি খাব না।

কন্যার অবস্থা দেখিয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া মায়ের রাগ গলিয়া জল হইয়া গেল। তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া কান্না আসিল। কিছুদিন হইতে তিনি কন্যার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন এবং তাহার কারণও সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধারণা ছিল, এটা বেশীদিন স্থায়ী হইবে না। প্রথম প্রথম এই রকমটাই হইয়া থাকে। কিছুদিন গেলে আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে। সেই জন্য এ-পর্য্যন্ত কন্যার এই মনোবিকৃতিকে তিনি ধম্‌কাইয়া ধাম্‌কাইয়া সোজা করিবার

চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, আদৌ তাহাকে আমল দেন নাই। কিন্তু আজ যাহা দেখিলেন, যাহা বুঝিলেন, তাহাতে তাঁহার সে-ধারণা একেবারেই উল্টাইয়া গেল। কন্যাকে তিরস্কার করিতে গিয়া তিনি নিজে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না।

একটুখানি সাম্‌লাইয়া লইয়া তিনি কন্যার পাশে বসিয়া আস্তে আস্তে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর শান্ত স্নেহকণ্ঠে বলিলেন, কি কোর্‌বে মা! সে তো বুঝুলেও বুঝ্‌বে না, বারণও শুন্‌বে না। নিজের যা' খুশী তাই কোরে বেড়াবে। এমন কোরে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে পোড়ে থাকলে যদি সে ফির্‌তো, তা'হোলে না হয় থাকতে; কিন্তু তা' তো সে ফির্‌বে না। তবে আর মিছিমিছি নিজের দেহটাকে মাটী কোরে লাভ কি?

লতিফা আর কোন উত্তর দিল না। যেমন ছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল।

মা আবার বলিলেন, আমি তাঁকে লোকমারফতে বোলে পাঠিয়েছি, চিঠি লিখে পর্য্যন্ত বারণ কোরেছি, যাতে ওসব ঝঞ্ঝাটে আর পা না দেয়, কিন্তু কিছুতেই ত সে শুন্‌ল না। শেষকালে নিমিষের জন্য একবার দেখা কোর্‌তে অনুরোধ কোরে লিখে পাঠালুম, তা-ও এলো না। তবে আর—

সহসা নীচে পরিচিত কলকণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল, চাচী-আম্মা!

কথা শেষ না করিয়াই লতিফার মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, উপরে এসো।

লতিফা বিপরীত দিকে পাশ ফিরিয়া শুইল।

সঈদ উপরে উঠিয়া একেবারে সরাসরি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। হাসিমুখে কহিল, কাজের বড় ভিড় চাচী-আম্মা! মোটেই সময় কোরে

উঠ্‌তে পারি না। আজ এই পথেই বাড়ী ফির্‌ছিলুম, তাই একবার এলুম।

কথা বলিতে বলিতে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া সে বসিয়া পড়িল।

লতিফার মা একটু অনুযোগের সুরে বলিলেন, তা' আর এলে কেন? না এলেই ত পার্‌তে বাছা!

তেমনি হাসিমুখে সঈদ বলিল, তুমি রাগ কোরেছ চাচী-আম্মা! কেন? দেশের কাজে যদি দশদিন তোমাদের ছেড়ে থাকি, তা'তে রাগ কোর্‌বে কেন?

—কি জানি বাছা, এ কেমন দেশের কাজ! আপন জনের সঙ্গে একটীবার দেখা করবারও সময় পাওয়া যায় না। বুঝি না বাপু ওসব!

সঈদের মুখে আবার হাসি! বলিল, আচ্ছা তোমায় একদিন ভাল কোরে বুঝিয়ে দেব—তা'হোলে ত হবে? কিন্তু খবরদার তখন আর আমার উপর রাগ কোর্‌তে পার্‌বে না।

সেই সরল সুন্দর হাসিমাখা মুখ, উজ্জ্বল চক্ষু, মুখে কথার ফোয়ারা! লতিফার মা'র রাগ প্রসন্নতায় গলিয়া পড়িল। বলিলেন, আচ্ছা দেখা যাবে। এখন একটু ঠাণ্ডা হও দিকিন। পেটে কিছু পড়েনি বোধ হয়!

—যথেষ্ট পোড়েছে। সকালে যে নাস্তার বহর চোলেছে, তাতে সন্ধ্যার আগে আর ক্ষিদের সাড়া পাওয়া যাবে বোলে ত মনে হয় না। তবে একটু পানি খেতে হবে। রোদের চোটে গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

—আচ্ছা তুমি বোসো, আমি পানি আন্‌ছি

লতিফার মা চলিয়া গেলেন।

ঘরে ঢুকিয়াই সঈদ লতিফাকে লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু কথা বলিবার সুযোগ হয় নাই। চাচী-আম্মা চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিল, লতি, অমন কো'রে শুয়ে আছো কেন ?

সঙ্গে সঙ্গে সে চেয়ারখানা একটু আগাইয়া লইয়া বসিল।

লতিফা বিপরীত দিকে ফিরিয়াই উত্তর করিল, শরীর ভাল না।

—শরীর ভাল না! কি হোয়েছে!

লতিফা কোন উত্তর দিল না।

সঈদ আবার বলিল, কি হোয়েছে বলো না। আমার কাজ আছে যে, বেশীক্ষণ বোস্‌তে পার্‌বো না।

—আমি কি বোস্‌তে বোল্‌ছি।

লতিফার অন্তরটা যে অভিমানের ঘন মেঘে ছাইয়া আছে, সঈদ তাহা ভালরূপেই বুঝিল; কিন্তু তাহার অভিমান বা রাগকে সে কোনদিনই আমল দেয় নাই। হাসির বাতাসেই উড়াইয়া দিয়াছে। কাজেই আজও আমল দিল না। একগাল হাসিয়া কহিল, তা বোল্‌ছ না বটে, কিন্তু না বোল্‌লেও আমি বোস্‌ছি। আর—

হঠাৎ লতিফার মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, কি সর্ব্বনাশ কোর্‌লি বাছা, শেষে নিজেও মলি, আমাদেরও মেরে গেলি।

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাচী-আম্মার মুখের পানে চাহিয়া সঈদ জিজ্ঞাসা করিল, কি হোয়েছে চাচী-আম্মা! কি সর্ব্বনাশ কোরেছি!

—আর "কি সর্ব্বনাশ কোরেছি!" বাড়ীতে যে পুলিশ এসেছে হতভাগা ছেলে!

সঈদের মুখখানা সহসা ভাস্বর হইয়া উঠিল। একটুখানি হাসিয়া বলিল, তা'তে 'সর্ব্বনাশ' কি হোলো চাচী-আম্মা! এ তো পরম আনন্দের কথা!

লতিফা ততক্ষণ বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। সঈদ বলিতে লাগিল, আমার সৌভাগ্য যে এতদিনে আমার জেলে যাওয়ার সুযোগ হোয়েছে। যাক্—পুলিশ কোথায়?

—তোদের বাড়ীতে আর কোথায়!

—আমাদের বাড়ীতে! তোমায় খবর দিলে কে?

—সেই হ্যাংলা চাকরটা তোকে খুঁজ্‌তে এসেছিল।

—তা'কে কি বোলে দিলে?

—বল্লুম এখানে আসেনি।

—অন্যায় কোরেছ চাচী-আম্মা! কেন মিথ্যা কথা বোলতে গেলে। না,—যদিও বা খানিকক্ষণ বোস্‌তুম, তা' আর হোতে দিলে না। এখুনি উঠিয়ে তবে ছাড়্‌লে।

সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চাচী-আম্মা তাহার সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া কহিলেন, সে কি! কোথায় যাবি?

—কেন—বাড়ী?

—বাড়ী? পুলিশ যে এখনো তোর অপেক্ষায় বোসে আছে?

—আছে বোলেই ত যাচ্ছি চাচী!

তাহার মুখে গম্ভীর হাস্য, চক্ষে প্রশান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি। লতিফার মা'র বাধা দিবার সাহস হইল না। সে ধীর পদ-বিক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

লতিফার মা তাহার গতিপথ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। লতিফা আবার বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

৩

বিচারে সঙ্গীদের দুই বৎসরের কারাদণ্ড হইল। বিপুল বন্দেমাতরম্ ও জয়ধ্বনির মধ্যে দেশবাসী তাহাকে কারার পথে বিদায় দিয়া ঘরে ফিরিল।

সমগ্র কলিকাতা শহরে তথা সারা বাংলাদেশে সঙ্গীদের জয়জয়কার পড়িয়া গেল। তাহার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। সকলেই শত মুখে তাহার ত্যাগ, কর্ম্মনিষ্ঠা ও স্বদেশ-প্রাণতার প্রশংসা করিল।

কিন্তু এই প্রশংসা-বাণী ও জয়জয়কার লতিফার কানে হাহাকারের মত বাজিয়া উঠিল। বিচার-ফল শুনিবামাত্র দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সেই যে সে বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল, সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর কেহ তাহাকে তুলিতে পারিল না।

লতিফার মা-বাপ মহাসমস্যায় পড়িলেন। এক আধ দিন নয়, দুইটা দুইটা বৎসর। কেমন করিয়া মেয়েকে আইবুড়ো করিয়া রাখিবেন। কাজেই নিরুপায় হইয়া এক দিকে তাঁহারা মেয়েকে বুঝাইয়া পাড়াইয়া শান্ত করিতে লাগিলেন এবং অন্যদিকে তলে তলে পাত্রের সন্ধানে মন দিলেন।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাত্র মিলিল। ছেলেটা বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। পড়াশুনা ছাড়িয়া এখন শেয়ার মার্কেটে দালালী করিতেছে। উপার্জ্জনও বেশ দুই পয়সা আছে। তবে একটা দোষ—তাহার তিন কুলে কেহ নাই। কিন্তু লতিফার বাপ এ দোষটাকে দোষ বলিয়া আদৌ মনে করিলেন না। বরং সুবিধাই বুঝিলেন। মেয়েকে ঝঞ্ঝাট পোয়াইতে হইবে না।

যথাসময়ে বিবাহ হইয়া গেল। লতিফা কোন আপত্তিও করিল না, আগ্রহও দেখাইল না।

*　　*　　*　　*　　*

তুই বৎসর পরের কথা। সন্ত-জেলমুক্ত সঈদ্ ট্রাম হইতে নামিয়া বাড়ীর পথ ধরিয়াছে। সহসা বাম দিকের গলিতে অস্ফুট আর্ত্ত চীৎকার শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার সে আর্ত্তস্বর গুমরিয়া উঠিল। কৌতূহলী হইয়া সে গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে বাড়ী হইতে শব্দ আসিতেছিল, তাহার দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজার সম্মুখেই উজ্জ্বল গ্যাসের আলো, বাড়ীর সম্মুখের উঠানটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সঈদ কাণ পাতিয়া সুস্পষ্ট শুনিতে পাইল, কে কাহাকে কিল চড় লাথি দিয়া বেদম প্রহার করিতেছে। প্রহার-শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই আর্ত্ত গুমরণ ধ্বনিয়া উঠিতেছে। সঈদ্ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্তত: করিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল ঘরের ভিতর হইতে একটা লোক একজন স্ত্রীলোকের গলা ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া উঠানে আনিয়া ফেলিল, তাহার পর তাহার কোমরে সজোরে গোটা তুই লাথি বসাইয়া দিল। রমণীর বুক ফাটিয়া আর্ত্তস্বর বাহির হইল।

সঈদ আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। উন্মাদের মত যাইয়া লোকটার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহার নাসিকা-লক্ষ্যে বজ্রমুষ্টি তুলিল।

—দোহাই—মেরো না—উনি আমার স্বামী।

বিস্মিত সঈদ পিছু হটিয়া আহতার মুখের পানে চাহিল। পরক্ষণেই অন্ধকার-পথে সর্পদষ্ট পথিকের মত সে আঁত্‌কাইয়া উঠিল—এ কি! লতিফা !!

নিখিল সংসার কুমোরের চাকের মত সঙ্গীদের চোখের উপর ঘুরিতে লাগিল। লোকটা তাহার পাশেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া টলিতেছিল, তাহার মুখ দিয়া ভর্ ভর্ করিয়া মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল। সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া একটা বিশ্রী মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, কি বাবা, পছন্দ হোয়ে গেল নাকি!

সঙ্গীদের পিঠে কে যেন সহস্র চাবুক একসঙ্গে বসাইয়া দিল। আর মুহূর্ত্তকালও সে এ-নরকে তিষ্ঠাইতে পারিল না। নীরবে নতমস্তকে সে দরজা পার হইয়া গলিতে গিয়া পড়িল।

দিন-মজুরের জীবন-পঞ্জী

মধু ছিল একটু 'হাবা-জাবা' গোছের মানুষ। সমস্ত দিন হাড়-ভাঙা খাটুনী খাটিত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিত, কিন্তু মজুরী পাইত ষোল আনার জায়গায় ছয় আনা কি আট আনা। যাহারা তাহাকে দিয়া কাজ করাইত, তাহারা তাহার বোকামীর সুযোগ ষোল আনা রকমেই গ্রহণ করিত। তাই কোন দিন হিসাব ভুল করিয়া, কোন দিন বা 'হার' কমাইয়া ন্যায্য পাওনা আধা-আধি বা দশ আনা ছ' আনা করিয়া মধুকে বিদায় দিত। মধুও 'টুঁ' শব্দটী না করিয়া যাহা পাইত, তাহাই হাতে করিয়া ঘরে ফিরিত। এতটুকু আপত্তি কেহ কোন দিন তাহার মুখ হইতে শুনিতে পায় নাই। অসন্তোষের ম্লানিমা তাহার সদা-প্রফুল্ল মুখ-খানিকে দিনেকের তরেও আঁধার করিতে পারে নাই। সে যেন নির্ব্বিকার—নির্লোভ। যে হাসিমুখ লইয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইত, সেই হাসিমুখ লইয়াই আবার বাড়ী ফিরিত,—তা' কিছু পা'ক চাই না পা'ক। পাওয়া না পাওয়ার বা তাহার কম-বেশী তারতম্যের জন্য কোন মাথা-ব্যথাই যেন তাহার ছিল না।

কিন্তু স্ত্রী রঙিলা ছিল ঠিক ইহার বিপরীত। সে চতুরা—বুদ্ধিমতী। প্রত্যেক জিনিসের কড়ায় গণ্ডায়—খুঁটীনাটী হিসাব তাহার চাই-ই চাই।

স্বামী সমস্ত দিন কি করিল না করিল,—কি কাজ কত 'হারে' কতখানি করিয়া আসিল ; সন্ধ্যার পর সে সমস্তই হিসাব লইত এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর দেওয়া পয়সা গণিয়া ন্যায্য পাওনার হিসাব মিলাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রাপ্ত পয়সার সঙ্গে প্রত্যহই তাহার হিসাবের গরমিল হইত। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে এই ব্যতিক্রম দূর করিতে পারিত না। ক্ষোভে দুঃখে বকিয়া ঝকিয়া 'মাথামুড়' খুঁড়িয়া সে একাকার করিত। মধু কিন্তু নির্ব্বিকার। রঙিলার হাতে মজুরীর কড়ি সঁপিয়া দিয়া 'খরশান' সাজিয়া সে বেশ নিশ্চিন্ত মনেই খেলো হুঁকায় টানের পর টান চড়াইত।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া চলিয়াছিল এই ডোম-দম্পতীর।

সন্ধ্যার পর দরকারী কাজকর্ম্ম সারিয়া একলাটী রঙিলা ছোট্ট ঘরখানির রোয়াকে পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। অন্য দিন হইলে এতক্ষণ সে রান্নাবান্না লইয়া ব্যস্ত থাকিত, কিন্তু আজ ঘরে চাল বাড়ন্ত। মজুরীর পয়সা লইয়া মধু চা'ল ডা'ল কিনিয়া আনিবে, তবেই হাঁড়ি চড়িবে ; কাজেই স্বামীর আসা-পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় কি!

আজ পাঁচ বৎসর হইল রঙিলা এ-ঘরে ঘরকন্না করিতে আসিয়াছে। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে আজ প্রথম তাহার ঘরে চাল 'বাড়ন্ত'। 'হাবা-জাবা' স্বামী হইলেও নিজের বুদ্ধিতে সে তাহাকে বেশ 'গুছাইয়া গাছাইয়া'ই এতদিন চালাইয়া আসিয়াছে। কোন দিন এতটুকু অভাবের মধ্যে পড়িতে দেয় নাই বা নিজেও পড়ে নাই। কিন্তু আজ তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তবে ইহার জন্য তাহার দুঃখ করিবার কিছুই নাই। কারণ এ-ঘটনায় তাহার নিজের বা স্বামীর কাহারও কোন হাত নাই। এটা নিতান্তই দৈব। গত সাত দিনের বর্ষার ফলে কাজ কর্ম্ম একেবারেই বন্ধ! দিন-মজুরের ঘরে কত চাল ধান জমা থাকে যে, পুরাপুরি সাতটা

দিন দুইজন লোক নিষ্কর্ম্মা বসিয়া খাইতে পারে! কাজেই আজ সকাল হইতেই রঙিলার ঘরে চাল বাড়ন্ত। সকালে অভুক্ত স্বামী কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই। কাজেই রঙিলা আকুল প্রতীক্ষায় তাহার পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছে।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড হইয়া গেল। রঙিলা চঞ্চল হইয়া উঠিল। অন্ধকার রাত্রি। কে জানে কোথায়—

সহসা পরিচিত কণ্ঠস্বরে তাহার সকল উদ্বেগের অবসান হইল। প্রসন্ন হাস্যে সারা মুখখানি ভরিয়া উঠিল। মধু ডাকিল, রঙি!

তাহার স্বর আনন্দ-গদ্‌গদ।

মনের আনন্দ মনে চাপিয়া কণ্ঠস্বরে একটু বিরক্তি ফুটাইয়া রঙিলা বলিল, রাত দুপুর না হোলে বুঝি আর বাড়ীর কথা মনে পড়ে না?

মধু কোন উত্তর দিল না। সরাসরি রোয়াকে উঠিয়া একেবারে রঙিলার সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। পাশেই কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল। তাহার আলোকে রঙিলা দেখিল, স্বামীর সারা মুখখানিতে পুলকের বন্যা খেলিয়া চলিয়াছে। তাহারও বুকের ভিতরটা আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। কিন্তু যথাসাধ্য নিজেকে দমন করিয়া সে রাগের ছলা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত কোথায় থাকা হোয়েছিল শুনি?

একগাল হাসিয়া মধু বলিল, আগে কি এনেছি দেখ্, তারপর আমায় বকিস্ এখন।

সে কাপড়ের 'খুঁট' হইতে একটা নাকচাবি খুলিয়া রঙিলাকে দেখাইয়া বলিল,—কেমন, এইবার?—হি-হি-হি!

একবার আড়চোখে চাহিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া রঙিলা বলিল, থাক্

আর দেখাতে হবে না, এখন চা'ল ডা'ল কি এনেছ দাও দিকিন্! রান্নাবান্না আর হবে কখন্?

মুহূর্ত্তে মধুর সারা মুখখানি ছাইএর মত সাদা হইয়া গেল। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়! নাকচাবি কিনিতে মজুরীর চৌদ্দ আনা পয়সাই যে সে খরচ করিয়া আসিয়াছে! চা'ল ডা'লের কথা যে তাহার মনেই ছিল না, এখন উপায়! সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া রঙিলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রঙিলা সব বুঝিল। রাগে তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই এই তদ্গতপ্রাণ আপন-ভোলা সরল মানুষটীর দুর্লভ ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া যুগপৎ শ্রদ্ধা ও করুণায় তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। কিন্তু প্রাণের কথা সে প্রাণেই চাপিল। স্বামীকে সে তিরস্কার বা সমাদর কিছুই করিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

মধু অনেকক্ষণ হতভম্বের মত একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর গত্যন্তর নাই দেখিয়া সেইখানেই—রোয়াকের উপর গামছা পাতিয়া তাহার উপর ক্লান্ত দেহখানি ঢালিয়া দিল।

২

'সখ' বলিতে রঙিলার বিশেষ কিছুই ছিল না। সেই জন্য ভাল কাপড় বা 'গয়না গাঁটীর' জন্য কোনও দিনই সে মধুর কাছে কোন অনুযোগ করিত না। মোটা 'কস্তা' পেড়ে শাড়ী আর দুই হাতে দুই গাছা কাচের চুড়ী হইলেই তাহার যথেষ্ট হইত। তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকিত। মধুও এ-সম্পর্কে এক প্রকার নিশ্চিন্ত উদাসীন ছিল। গায়ে পড়িয়া—যাচিয়া কোন দিনই সে রঙিলাকে কিছু আনিয়া দিত না। অবশ্য বিনা হুকুমে পয়সা খরচ করিলে পাছে রঙিলা রাগ করে—বকাবকি করে। নইলে তাহাকে মনের মতনটী করিয়া সাজাইবার ইচ্ছা যে মধুর ছিল না তাহা নহে।

কিছুদিন আগে বাজারে কীর্ত্তন শুনিতে গিয়া মধু কীর্ত্তনওয়ালীর নাকে একটা সুন্দর নাকচাবি দেখিয়া আসিয়াছিল। উজ্জ্বল আলোকে নাক চাবির কল্যাণে কীর্ত্তনওয়ালীকে কি সুন্দরই না মানাইয়াছিল! বাড়ী ফিরিবার পথে মধুর মনে হইল, এম্‌নি একটা নাকচাবি যদি সে তাহার রঙিলাকে আনিয়া দিতে পারিত!

বাড়ী আসিয়া মধু কল্পনাটাকে আর মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সরাসরি রঙিলাকে বলিয়া বসিল। রঙি, তুই নাকচাবি পরবি?

রঙিলা ঠাট্টার সুরে বলিল, পোরবো বই কি, এনেছ নাকি? সারা মুখ খানিতে হাসি ভরিয়া মধু বলিল, না আনিনি, তুই যদি বলিস্ তা'হোলে এনে দিই।

রঙিলা আগের মতই রহস্য করিয়া বলিল, ও—এই কথা! আমি মনে কোর্‌ছি বুঝি এনে টেনে আমায় পোর্‌তে বোল্‌ছ।

বুদ্ধি-শুদ্ধির বিশেষ অভাব থাকিলেও মধু এ ঠাট্টাটা বুঝিয়াছিল এবং সেই জন্যই রঙিলাকে নাকচাবি উপহার দিবার একটা উপায় সে খুঁজিয়াছিল।

কিন্তু উপায় কি হইবে? কোন দিন ছয় আনা, কোন দিন দশ আনা, কোন দিন বা বারো আনা,—এই ত তাহার রোজগার। ইহা দিয়া ত নাকচাবি কেনা চলে না। দুই দিনের বা তিন দিনের মজুরী জমাইয়া যে একাজ করিবে, তাহারও উপায় নাই। বাড়ী ফিরিয়াই দিনের দিন রঙির হাতে সব ধরিয়া দিতে হয়, নাকচাবি কিনিবে বলিয়া তাহার নিকট হইতে আর কিছু চাহিয়া লওয়া চলে না; কাজেই ইচ্ছা সত্ত্বেও মধু এতদিন কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই।

শেষে সুযোগ ঘটিল বাদলে। সাত দিনের একটানা বর্ষায় মধুর মত অনেকের ঘরেই চাল বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই নিরুপায় হইয়া 'এটা সেটা' বেচিয়া বন্ধক দিয়া পেটের উপায় করিতেছিল। এই অনেকের ভিতরই একজনের নিকট হইতে মধু তাহার বড় সাধের নাক-চাবিটী খরিদ করিয়াছিল। কাজের ফেরৎ বাজার করিতে যাইয়া সে সমস্ত পুঁজি নিঃশেষ করিয়া এই বাজার করিয়া ঘরে ফিরিয়াছিল। ফল যাহা দাঁড়াইয়াছিল, আগেই বলিয়াছি।

* *

রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত মাদুরের উপর এ-পাশ ও-পাশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অসহ্য হওয়ায় রঙিলা উঠিয়া বাহিরে আসিল। স্নিগ্ধ-শুভ্র চাঁদের আলোয় নিখিল সংসার তখন হাসিতেছে। রোয়াকে গামছার বিছানা পাতিয়া মধু অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। পাশের কেরোসিনের ডিবাটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া কখন নিভিয়া গিয়াছে। রঙিলা আস্তে আস্তে মধুর শিয়রে

আসিয়া বসিয়া পড়িল। একদৃষ্টে তাহার ঘুমন্ত মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কোমল স্নেহস্পর্শে ঘুম ভাঙিতেই মধু চমকিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর রঙিলার মুখের পানে চাহিয়াই কি জানি কেন মুখখানি নীচু করিল।

রঙিলা কোমল কণ্ঠে বলিল, ঘরে চলো। ঠাণ্ডা লাগবে। মধু দ্বিরুক্তি করিল না। আস্তে আস্তে উঠিয়া ঘরে গেল। রঙিলাও তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল।

শুইয়া পড়িয়া রঙিলা বলিল, এমন বোকামী কি কোর্‌তে আছে? ঘরে চাল 'বাড়ন্ত',—ও না হয় দু'দিন পরেই আন্‌তে। তাড়াতাড়ির ত কিছুই ছিল না!

রঙিলার কণ্ঠস্বরে ক্রোধের পরিবর্ত্তে স্নেহ ও কোমলতা পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিল।

মধু চুপ করিয়া রহিল।

রঙিলা আবার বলিল, কাল সকালে কি খেয়ে বেরুবে বল দিকিন্ এখন! আজ সমস্ত দিন-রাত্তির উপোস গেল, কালও সারাটা দিন যাবে। এরকম কোরে কি মানুষ বাঁচে! কোন্ দিন দেখ্‌ছি—

রঙিলার স্বর ধরিয়া আসিল। অলক্ষিতে চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

এবার আর মধু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। এতক্ষণ সে বিপরীত দিকে মুখ করিয়া শুইয়া ছিল। এবার রঙিলার দিকে ফিরিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, তুই রাগ করিস্‌নি রঙি, আর কক্ষনো আমি এমন কাজ কোর্‌বো না।

রঙিলার দুঃখ যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মধু তাহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া পিঠে স্নেহের পরশ বুলাইতে বুলাইতে বলিল, আমায় মাফ্ কর্ রঙি!

৩

তিন মাস পরের কথা।

অনেকখানি রাত্রি হইয়াছে। রান্না বান্না শেষ করিয়া রঙিলা মধুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে। উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায় তাহার বুকের ভিতরটা ঢিব ঢিব করিতেছে। কাজে গিয়া কোন দিনই ত এত রাত করে না। তবে আজ কেন এমন হইল? রঙিলা ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কারণই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। কাজেই তাহার উদ্বেগ-আশঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া সে 'ঘর-বার' আরম্ভ করিয়া দিল।

অবশেষে মধু দেখা দিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তিতে। সে মূর্ত্তি রঙিলার কাছে একেবারেই অপরিচিত।

রোয়াকে উঠিয়াই একটা 'টাল' খাইয়া মধু ডাকিল, রঙি!

তাহার স্বর অর্দ্ধজড়িত।

রঙিলা অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধরিতে যাইয়াই সহসা দুই পা পিছাইয়া আসিল। একটা পচা গন্ধে তাহার যেন নিশ্বাস আট্‌কাইবার উপক্রম হইল। সে নাকে কাপড় দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

মধু আবার বলিল, মাদুরটা পেতে দে ত রঙি!

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে ভূতল আশ্রয় করিল।

রঙিলা সব বুঝিল। দুঃখে রাগে তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল।

রাত্রির শেষ প্রহরে নেশা ছুটিয়া গেলে মধু উঠিয়া বসিল। একপাশে মেজের উপর রঙিলা উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। তখনও সে ঘুমের

ঘোরে এক একবার ফুলিয়া উঠিতেছিল। মধুর বুঝিতে বাকী রহিল না যে সমস্ত রাত্রি রঙিলা কাঁদিয়া কাটাইয়াছে। খানিকক্ষণ সে একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার নিকটে গেল। গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, রঙি!

রঙিলা 'উঁ' করিয়া একবার সাড়া দিয়া আবার চুপ করিল। মধু পুনরায় ডাকিল। সাড়া নাই। আবার ডাকিল। আবার—আবার। অনেক ডাকাডাকি নাড়ানাড়ির পর রঙিলা উঠিয়া বসিল। মিনতিভরা কণ্ঠে মধু বলিল, এক ঘটী জল দে রঙি, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

রঙিলা কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে এক ঘটী জল আনিয়া মধুর সাম্‌নে রাখিয়া ঘরের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল।

মধুর নেশার ঘোর যদিও তখনও একটু-আধটু ছিল, তথাপি নিজের অবস্থাটা সে সম্যকরূপেই বুঝিতে পারিল। পয়সা কত অবশিষ্ট আছে দেখিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি কাপড়ের খুঁট খুলিল। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষু-তারকা ঊর্দ্ধে উঠিল। সর্ব্বনাশ! এক পয়সাও যে নাই! সকালে রঙিলাকে সে কি জবাব দিবে!

তখন ভোরের পাখী ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সহকর্ম্মী শয়তানদের পাল্লায় পড়িয়া মধু আজ তাড়ির আড্ডায় ঢুকিয়াছিল এবং সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনীর ফলে যাহা কিছু পাইয়াছিল, সমস্তই সেখানে বিসর্জ্জন দিয়া রিক্ত হস্তে ঘরে ফিরিয়াছিল। তাহার পর যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

সকালে উঠিয়া রঙিলা যতদূর সম্ভব মধুর উপর 'এক হাত' লইল। তাহার পর রাগ একটু পড়িয়া আসিলে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া অনেক

বুঝাইয়া আর ও 'গোরক্ত' না খাইবার জন্য স্বামীকে মাথার দিব্য দিয়া কাজে বিদায় দিল।

কিন্তু সে রাত্রিতে আবার ঠিক সেই অবস্থা। মধু টলিতে টলিতে আসিয়া রোয়াকের উপর পড়িয়া গান ধরিল—"কোন্ ঘাটে চান করলি কানাই গামছা কোথা হারালি!"

ক্ষোভে, অপমানে, লজ্জায় রঙিলা মরিয়া হইয়া উঠিল।

৪

দু'টী মাস কাটিয়া গিয়াছে।

ছেঁড়া মাদুরের উপর রঙিলা লুটাইয়া পড়িয়া আছে। তাহার দেহ শীর্ণ, হাড় কয়খানি মাত্র অবশিষ্ট আছে। চোখ দুইটী কোটরের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে। সহসা দেখিলে প্রেতিনী-ভ্রমে মনে আশঙ্কার সঞ্চার হয়।

বাঘ যেমন একবার নর-রক্তের স্বাদ পাইলে উন্মত্ত হইয়া উঠে, মধুর অবস্থাও হইয়াছিল ঠিক তদ্রূপ। সেই যে প্রথম দিন তাড়ি খাইয়া সে মাতাল হইয়া ঘরে ফিরিয়াছিল, সেই হইতে নেশার মজা এমনভাবে তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল যে, কিছুতেই সে আর নিজেকে ফিরাইয়া লইতে পারে নাই। প্রথম প্রথম দুই একদিন রঙিলার বকুনির ভয়ে সে আড্ডায় যাইতে একটু-আধটু ইতস্ততঃ করিত বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর তাহাও করিত না। ফলে প্রত্যহ রাত্রিতেই সে 'চুরচুরে' মাতাল হইয়া ঘরে ফিরিত। মজুরী কোন দিন একেবারেই নিঃশেষ হইয়া যাইত, কোন দিন বা দুই চারিটী পয়সা অবশিষ্ট থাকিত।

কিন্তু দিন-মজুরের সংসার এই ভাবে কয়দিন চলে। রঙিলা 'বকিয়া ঝকিয়া' কাঁদিয়া কাটিয়া 'কত কি' করিয়া দেখিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষে সে হাল ছাড়িয়া দিল। অনাহারে অর্দ্ধাহারে একেই তাহার শরীর ভাঙিয়া আসিয়াছিল, তাহার উপর আবার দুশ্চিন্তা। সে জ্বরে পড়িল। ঔষধ নাই, পথ্য নাই, কেহ দেখিবার নাই, পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও মুখে একটু জল দিবার কেহ নাই; দিনে দিনে তাহার অবস্থা অতিমাত্রায় শোচনীয় হইয়া উঠিল।

মধু প্রত্যহ অনেক রাত্রে একবার করিয়া বাড়ী আসে বটে, কিন্তু তখন সে 'বুঁদ' মাতাল। কিছু দেখিবার বা শুনিবার মত অবস্থা তখন তাহার মোটেই থাকে না। নিতান্ত যে দিন একটু খাড়া থাকে, সে দিন একবার ডাকিয়া সাড়া লয়—রঙি! এই পর্য্যন্ত।

পূর্ব্বে মধু কাজে যাইত রঙিলার মুখ চাহিয়া,—তাহাকে সুখী করিবার জন্য; আর এখন যায় তাড়ির আড্ডার রসদ সংগ্রহের জন্য। রঙিলা খাইল কি না খাইল, পরিল কি না পরিল, মরিল কি বাঁচিল;—তাহা দেখিবার অবসর এখন আর তাহার নাই। এখন তাড়ি পাইলেই তাহার সব কাজ মিটিল। পেটে কিছু পড়ুক চাই না পড়ুক।

এক মাসের উপর হইতে চলিল, রঙিলা জ্বরে পড়িয়াছে। চিকিৎসা-পত্র দূরের কথা, দুই পয়সার সাগু মিছরি আনিয়াও মধু কোন দিন তাহার 'তত্ত্ব' লয় না। এতদিন যে রঙিলা বাঁচিয়া আছে, তাহা কেবল প্রতিবেশিনী ষষ্ঠীর মা'র কল্যাণে। সে-ই দয়াপরবশ হইয়া মাঝে মাঝে সাগুটা মিছরিটা 'দুধটা-আস্‌টা' দিয়া এক একবার দেখিয়া শুনিয়া যায়।

মধু বাড়ী ফিরিয়া ঘরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ডাকিল, রঙি!

সাড়া নাই।

সে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিদ্‌ঘুটে অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইল না। হাত্‌ড়াইয়া হাতড়াইয়া দিয়াশলাই সংগ্রহ করিয়া কোন রকমে কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালিল। কিন্তু রঙিলার মুখের পানে চাহিতেই তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। দীর্ঘ একমাস পরে আজ সে রঙিলার কাছে আসিয়াছে।

আজিকার পাওনা বড় সুবিধাজনক হয় নাই। পেটে বেশী কিছু পড়িতে পায় নাই ; কাজেই মাথাটা অনেকটা ঠিক ছিল। অনেকক্ষণ মধু একদৃষ্টে রঙিলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ডাকিল, রঙি !

তাহার আওয়াজ ধরা।

রঙিলা উত্তর দিল না। মধু আবার ডাকিল। রঙিলা চোখ মেলিয়া চাহিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আবার ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল। দুইটী অশ্রুবিন্দু দুই গণ্ডে নামিয়া আসিল। সে-অশ্রুবিন্দু বুঝি বা তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত অনন্ত বেদনার প্রতিভূ। মধুর বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল।

স্তব্ধ অভিভূতের মত মধু বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আবার ডাকিল, রঙি !

স্বর করুণ—ক্রন্দন-কম্পিত।

উত্তর নাই।

সে রোগিনীর কপালে হাত দিল। ডাকিল, রঙি !

রঙিলার সর্ব্বশরীর মুহূর্ত্তের জন্য একবার কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষু দুইটী হঠাৎ বিস্ফারিত হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইল এবং পরক্ষণেই আবার মুদিয়া আসিল।

সব শেষ !

আর্ত্ত চীৎকার মধুর বুকের ভিতর গুমরিয়া উঠিল।

*　　*　　*　　*

যথারীতি রঙিলার সৎকার করিয়া মধু বাড়ী ফিরিল। কিন্তু ঘরে উঠিল না। উঠানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ঘরের পানে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিল। শেষে একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া অন্যমনস্কে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। কাজ কর্ম্ম সারিয়া সকলেই ঘরের পথে ফিরিয়াছে। আর মধু? উদ্‌ভ্রান্ত—দিশাহারা। কোথায় চলিয়াছে—সে-ই জানে।

চলিতে চলিতে মধু আড্ডার সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। সহকর্ম্মীরা তখন সেখানে আসর জমাইয়া বসিয়াছে। একজন বলিয়া উঠিল, এই যে ইয়ার!—এসে পোড়েছ! আরে এস এস!

আর একজন এক 'খোপ' তাড়ি লইয়া একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অপরূপ ভঙ্গিমায় কহিল, এক পাত্তর টেনে নাও ত ধন! মাগের শোক—

রসিকতা শেষ না হইতেই মধু ভরা—'খোপ' ছিনাইয়া লইয়া সজোরে লোকটার মাথায় বসাইয়া দিল। সর্ব্বাঙ্গে তাড়ি মাখিয়া রক্তাক্ত শিরে সে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল।

মধু তাহার পানে আর ফিরিয়াও চাহিল না। সে যেমন চলিয়াছিল, তেমনই চলিল। কোথায়—কতদূরে—সে-ই জানে!

শেষ